নবাঙ্গন

সাহিত্য মানেই জীবনের কথা

১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৬

একুশ ডিজিটাল

নবাঙ্গন

বাংলা সাহিত্যকে ডিজিটাল রূপে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতেই নবাঙ্গন ই-ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু হল। প্রথম সংখ্যাতেই লেখকদের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে আমরা আনন্দিত। আশা করি ২১ শতকের বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের নতুনত্বের সাধ এনে দিতে পারবে নবাঙ্গন। সাহিত্য মানেই জীবনের কথা। সাহিত্যের নানা বুলিতেই ফুটে উঠে জীবনের মর্ম সত্য। ফুটে উঠে মানুষের ভাব-আবেগ, ফুটে উঠে জীবনের গল্প। সাহিত্য যেমন একজন মানুষের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে তেমনি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দ। ২১ শতকের যুগে মানুষের মনোযোগ এখন ডিজিটাল পর্দায়। আর সেই ডিজিটাল পর্দায় সাহিত্যের তৃষ্ণা মেটাতেই নবাঙ্গনের যাত্রা।

যোগাযোগঃ

nobangon@gmail.com

ekushdigital@gmail.com

https://facebook.com/ekushdigital

https://facebook.com/groups/nobangon

প্রকাশনায়

একুশ ডিজিটাল

facebook.com/ekhushdigital

লেখা আহবান

ই-ম্যাগাজিন নবাঙ্গন এর ২য় সংখ্যা মে ২০১৬ সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই এপ্রিল, ২০১৬

লেখা পাঠানোর বিভাগ সমূহ:

- গল্প(সর্বোচ্চ ৩ হাজার শব্দ)
- কবিতা
- ছড়া
- কার্টুন(চিত্র ও বাক্যালাপ সহ)
- ফিচার/আর্টিকেল(সমসাময়িক বিষয়/বিজ্ঞান/ খেলাধুলা)
- কৌতুক
- ছবি(হাতে আঁকা/ক্যামেরায় তোলা)
- ফ্ল্যাশ ফিকশন

লেখা পাঠানোর নিয়ম:

nobangon@gmail.com এ আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন। **Subject ঘরে অবশ্যই কোন বিভাগ এবং কোন মাসের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।** উদাহরণ হিসেবে, ছোট গল্প এপ্রিল। লেখার সাথে অবশ্যই আপনার নাম, জেলা উল্লেখ করতে হবে। লেখা অবশ্যই নিজস্ব হতে হবে এবং অন্য কোন মাধ্যমে অপ্রকাশিত হতে হবে (ফেসবুক ছাড়া) একজন লেখক সব বিভাগেই লেখা পাঠাতে পারেন তবে প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ একটি লেখা পাঠাতে পারবেন। **একই বিভাগে একটির বেশি লেখা পাঠালে তাকে অযোগ্য ভাবা হবে ওই সংখ্যার জন্য।**

নিয়মিত আপডেট পেতে একুশ ডিজিটাল পেজে চোখ রাখুন।

https://facebook.com/ekushdigital

এবং নবাঙ্গন এর গ্রুপে জয়েন করুন

https://facebook.com/groups/nobangon/

বিঃদ্রঃ ই-ম্যাগাজিন বলতে পিডিএফ ফরমেট এ প্রকাশিত ম্যাগাজিনকে বুঝায়। এছাড়া আপনার বই ও পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে আমাদের ইমেইলে যোগাযোগ করুন

সূচিপত্র

- কবিতাঃ দেবপ্রিয়া তোমায় একটি চিঠি অভিষেক কারক ৫
- পৃথিবীর রহস্যময় ১০ টি ছবি ৬
- বিশেষ দিন পহেলা বৈশাখ ১০
- কবিতাঃ উদাহরণ আহমেদ দীন রুমি ১৫
- ছড়াঃ মরণ ফাঁদ এইচ. এম আলমগীর ১৬
- গল্পঃ চাপা কান্না রিদওয়ান এইচ ইমন ১৭
- কবিতাঃ প্রেয়সীর খোঁজে মোঃ রবিউল আওয়াল ২০
- কবিতাঃ ২১ শে ফেব্রুয়ারী কৌশিক গাঙ্গুলি ২১
- ফিচারঃ বাংলা ভাষার বিবর্তন, শব্দভান্ডার, বৈচিত্র আর আমাদের সংরক্ষণের প্রচেষ্টা শৌমিক কুন্ডু ২২
- কবিতাঃ হৃদয়ের গোপনে অচেনা পথিক ২৬
- লেখক পরিচিতিঃ জহির রায়হান ২৭
- কবিতাঃ বৃদ্ধা এক এইচ. এম আলমগীর ৩৩
- কবিতাঃ অনিশ্চিত যাত্রা কেন নাসিম আহমদ লস্কর ৩৪
- ছোট গল্পঃ আবার ইখতিয়াক ইফাত ৩৫
- কবিতাঃ আত্ম সুখ অতনু নন্দী ৩৭
- কবিতাঃ জ্বর জাগানিয়া হৃদয় লোহানী ৩৮
- কবিতাঃ জরাজীর্ণ বৃক্ষ আব্দুল মান্নান মল্লিক ৩৯
- গল্পঃ ভাঙ্গা কলসি মোহাম্মদ তৌকির হোসেন ৪০
- কবিতাঃ জীবনের পথে আব্দুল্লাহ আল মোজাহিদ ৪৭

দেবপ্রিয়া তোমায় একটি চিঠি

অভিষেক কারক

এই যে শুনছ.....
অন্তঃপুরের মেয়ে,
তুমি সাধারন না অসাধারণ,-
কি আসে যায় তাতে।।

আমার চোখ তো, সাধারন নয় রে মেয়ে,
এইটুকুতেই পারবি থাকতে খুশি হয়ে?

আরে, শোনোই না.....
এলোমেলো মেয়ে,
তুমি কালো না সাদা,-
কি আসে যায় তাতে।।

তোর কালো চোখেই সব পেতে চাই,
পারবি হতে আমার সই?

ওগো দাঁড়াও, শোনো.....
খামখেয়ালি মেয়ে,
তোমার জামা পুরোনো না নতুন,-
কি আসে যায় তাতে।।

শুধু ওই হাসিটাই থাকিস পরে,
দেখবো আমি মন ভরে।

আরে ও মেয়ে, পালাও কেনো.....
শোনোই না—
আবার যে করছি আমি দুঃখবিলাসিতা।

ডুব দিয়েছি তোর চোখেতে,
তোর ঠোঁটেতে, ঐ হাসিতে—
আছে যে সব সুখ।
বন্দি আমি তোর চুলেতে,
তোর গালেতে, ঐ তিলেতে—
ভুলবো না তোর মুখ।।

এই তো সবে শুরু হলো,
সব হারানোর পালা;
দেবতাদের প্রিয়া যে তুই,
ভুলতে তোকে মানা।।

আরো আছে, বলি শোনো—
আমার, স্বপ্নবিলাসিতা,—

তোমার চোখের কালোতে দেখি
গভীর রাতের শিলাবতী।
তোমার ঠোঁটে খেলা করে,
তার চপল-চরণ গতী।
তোমার ভুরুর ঢেউয়ে আছে,
গনগণীর রুদ্র রূপ।
তোমার চুলেই পাই যে আমি,
গহীন বনের বন্য সুখ।।

বৃথা স্বপ্ন জানি—
তবু কি যে করি.....
মন যে হলো কবি,
তাকে কি আর ধরতে পারি।।

থাকি যে আমি অনেক দূরে;
ফারাক তোমার আমার সুরে।
মোটে তো মাস দুয়েক আর;
তারপরেতেই যাব ও-পার।।

আর কদিন পরে,
আসবে যখন প্রেমের ফাগুন;
তেপান্তরের পলাশ বনে
লাগবে যখন শীতল আগুন;
তখন আমি,
পাগল হব।
তোর প্রেমেতেই,
বৈরাগ্য নেবো।

যদি কখনো পড়ে মনে;-
এই কবিতায়, খেলার ছলে,
আজ নয়, হয়তো কোনো একদিন,-
বিছানায়-বালিশে, যখন তোমার রাত-ভোর স্বপ্নময়—
পারবে তাতে, করতে তোমার জীবন আমি-ময়?

পৃথিবীর রহস্যময় ১০ টি ছবি

১০। বাবুস্কা লেডিঃ ছবির মহিলাটিকে দেখা যায় ১৯৬৩ সালের আমিরকান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যা কান্ডের ঘটনার সময়। এ সময়, মহিলাটিকে খুব কাছ থেকে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ নিতে দেখা যায়। পরবর্তিতে এ মহিলাটিকে আর খুঁজে বের করা যায় নি। পুলিশ, এফবিআই সহ সামরিক সংস্থাগুলি এ মহিলাটিকে প্রকাশ্যে আসার আহবান জানালেও কেউ এগিয়ে আসে নি। কেউ কেউ মনে করেন জন এফ কেনেডি হত্যা কান্ডে এ মহিলাটি জড়িত। আবার কেউ বা মনে করেন, এ মহিলাটি টাইম ট্রাভেলার, যে ভবিষ্যঠ থেকে এসে ভিডিও করে নিয়ে যান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ন এ ঘটনাটি।

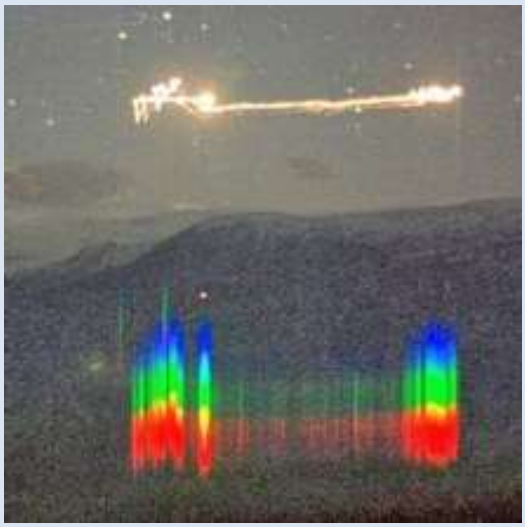

৯। হেসডেলেন লাইটসঃ নরওয়ের এক পাহাড়ি অঞ্চলে এ ঘটনাটি লক্ষ করা হয়। আকাশে অদ্ভুত বাতি দেখা যেতে থাকে। যার প্রকৃত ব্যাখ্যা কেউ এখনো দিতে পারে নি। ১৯৮১-১৯৮৪ সনের মধ্যে এ ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি বার ঘটে ছিল। তখন এটি সপ্তাহে ১৫-২০ দেখা দিত। তবে তা এখন বছরে ১৫-২০ বারে নেমে এসেছে। কেউ কেউ মনে করে এটি এলিয়েন স্পেসশিপ জনিত কোন কাজের কারনে সৃষ্টি হয়, কেউ বা দূর নক্ষত্র বা মহাকাশীয় ঘটনার কারনে ঘটে থাকে বলে মত প্রকাশ করেন। ২০১৪ সালের দিকে একদল বিজ্ঞানী দাবি করেন, পাহাড়েরধাতব পাথর আর পার্শবর্তী লেকের পানির সালফারের দ্বারা একপ্রকার ব্যাটারির সৃষ্টি হয় যা আয়োনাইজড গ্যাসের মধ্যে আলোর সৃষ্টি করে, তবে এখনও তা প্রমান করা যায় নি।

৮। হুক আইসল্যান্ডের সাগর-দানবঃ ১৯৬৪ সালের ১২ ই ডিসেম্বর এ ছবি গুলো হুক আইসল্যান্ডের পাশের সাগর থেকে তোলা হয়েছিল। ছবিতে এক বিশাল আকৃতির সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী দেখা যায়। যা আনুমানিক ৭৫-৮০ ফুট লম্বা। তবে এটি কি, বা কোন গোত্রের প্রাণী তা আজও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পায় নি। কারন এটিকে আর দেখা যায় নি। অনেকে ধারনা করেন এটি গভীর সাগরের কোন অজানা

প্রাণী যে ভুল করে উপরে উঠে আসে। অনেকে ধারনা করেন এটি ক্যামেরার কারসাজি, তবে ফটোশপ সে সময়ে ছিলই না। তাছাড়া অনেক প্রতক্ষদর্শী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

৭। সোলওয়ে স্পেসম্যান রহস্যঃ ১৯৬৪ সালের গ্রীষ্মে জিম টেমপ্লেটোন যখন তার স্ত্রী ও বাচ্চার ছবি তুলছিলেন তখন হয়তো তিনি বুঝতেই পারেন নি তার তোলা একটি ছবি পরিণত হবে বিশ্বব্যাপী বিতর্কের বিষয়ে। তার মেয়ের একটি ছবি ডেভেলপ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন মেয়ের পিছনে মহাকাশচারীর মত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাত তিনি বিষয়টি ছবি ডেভেলপকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে অভিযোগ হিসেবে জানালে তারা জানিয়ে দেয় ছবিতে কোন এডিটিং করা হয় নি। বিশ্বব্যাপী ইউএফও শিকারিরা এই ছবিকে এলিয়েনের অস্তিত্বের প্রমান হিসেবে দাবি করে আসছে। তবে ছবিটি আজও পর্যন্ত এক রহস্যই হয়ে আছে।

৬। এস এস ওয়াটারম্যান মুখমন্ডল রহস্যঃ ১৯২৪সালে এস এস ওয়াটারম্যান নামক জাহাজ নিউ ইয়র্কে ফেরার জন্য রওনা হচ্ছিল। পথিমধ্যে জেমস কোর্টনী ও মিকাইল মিহান নামের দুই নাবিক মালামাল পরিবহনের ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাদের সমুদ্রেই দাফন করা হয়। পরবর্তি দিনেই নাবিকেরা এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হন। তারা সাগরের পানিতে দাফনকৃত ব্যাক্তি দুজনের মুখের ছাপ দেখতে পান । ছাপ গুলো এতোই স্পষ্ট ছিল যে জাহাজের ক্যাপ্টেন কেইথ ট্রেসি ঘটনাটির ছবি তুলে নেন। আজও পর্যন্ত ঘটনাটি একটি রহস্য হয়েই রয়েছে।

৫। ব্লাক নাইগট স্যাটেলাইটঃ ১৯৫০ সালে ইউএফও বা অপরিচিত উড়ন্ত বস্তু গবেষক, ডোনাল্ড কিহোয় ইউএস এয়ার ফোর্সের রিপোর্ট করা কিছু ছবি প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন পৃথিবীকে ঘিরে এমন দুটি স্যাটেলাইট ঘুরছে যা মানুষের তৈরি নয়। ধারনা করা হয় স্যাটেলাইট দুটি ১৩ হাজার বছর ধরে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। মনে করা হয় এটির সাথে লং ডিলেইড ইচো এবং ১৮৯৯ সালে নিকোল টেসলা দ্বারা সংগৃহীত অপরিচিত রেডিও সংকেত এর যোগসূত্র রয়েছে।

৪। কুপার পরিবারের ডিনারের ছবিঃ কুপার পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে উঠার পর এটি ছিল তাদের প্রথম তোলা ছবি। ছবিতে ডিনার টেবিলের পাশে দেখা যায় কুপার ফ্যামিলিকে। তবে আশ্চর্য একটা জিনিস ও চোখে পরে, তা হল সিলিং থেকে গড়িয়ে পরা একটা অদ্ভুত দেহ। পরবর্তিতে পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করলেও কোন সমাধান পায় নি। বেশিরভাগ মানুষ মনে করে এটি একটি হোয়াক্স বা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য বানানো বিতর্কিত ছবি। তবে আসল ঘটনা এখনও রহস্যাবৃত হয়েই রয়েছে।

৩। চাদের পিরামিডঃ এপোলো ১৭ এর তোলা একটি ছবি যা চাদের অপর প্রান্ত থেকে তোলা হয়েছিল, যে প্রান্ত পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। ছবিটি নাসা ব্ল্যাঙ্ক বা খালি হিসেবে নথিভূক্ত করেছিল। কিন্তু কালো ছবিটির কন্ট্রাস্ট কিছুটা পরিবর্তন করলেই ফুটে উঠে এই ছবিটি। যাতে একটি পিরামিডের ন্যায় বস্তু চোখে পড়ে। অনেক সমালোচক বলে থাকে, এ ছবিই প্রমান করে চাঁদে পিরামিড রয়েছে, এছাড়া প্রাচীন বসতিও থাকতে পারে। অনেকেই আবার ছবিটিকে নাসার তথ্য লুকানোর প্রতীক হিসেবে গন্য করে থাকেন।

২। গড্ডার্ড স্কোয়াড্রন এর ছবিঃ ছবিটি ১৯১৯ সালে তোলা গড্ডার্ড স্কোয়াড্রনের একটি ছবি। ছবিটিতে একজন সৈন্যের পিছনে একটি মুখ দেখা যাচ্ছে। যার নাম ফ্রেড্ডি জেকসন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ছবিটি তোলার দুই দিন আগেই ফ্রেড্ডি জেকসন বিমানের প্রোপেলারের আঘাতে মারা যান। স্কোয়াড্রনের লিডার সহ সকলেই মুখটি জেকসনের বলে চিহ্নিত করেন।

১। ইলিসা ল্যামের মৃত্যুঃ লস এঞ্জেলেস এর হোটেল সেসিল এ থেকে লেখাপড়া করতো ২১ বছর বয়সী ইলিসা ল্যাম। ২০১৩ সালে হঠাতই নিখোজ হন তিনি। দুই সপ্তাহ পর হোটেলের পানির ট্যাংকিতে পাওয়া যায় ইলিসার লাশ। তবে হোটেলের ছাদ ও ট্যাংকির আশেপাশে যাওয়ার পথ বন্ধ ছিল। এছাড়া ট্যংকির

মুখ খুলে ফেলা একজনের সাধ্যের মধে ছিল না। তবে রহস্য বাধায় নিখোজ হওয়ার দিনে লিফটে ইলিসা ল্যামের একটি ভিডিও। ভিডিওটিতে দেখা যায়, ইলিসা কয়েকটি ফ্লোরের বাটন এবং ক্লোজ বাটন চাও দিলেও লিফটের দরজা বন্ধ হচ্ছিল না। তারপরের অংশে মনে হল ইলিসা ল্যাম কোন কিছু থেকে বাঁচতে লিফটের কোনায় লুকোচ্ছে (ছবিতে দেখা যাচ্ছে) কিন্তু লিফটের বাইরে কাউকেই দেখা গেল না। ইলিসা ল্যাম লিফটের বাইরে বের হয়ে ইতস্তত ভাবে আশে পাশে তাকায়, বার লিফটের ভিতরে ঢুকে আবার বাইরে বের হয়। এ সমস্ত সময়ে লিফটের দরজা বন্ধ হয় নি একবারও। ইলিসা ল্যাম চলে যেতেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে আবার খুলে যায়। আবার বন্ধ হয়ে লিফট পরের ফ্লোরে যায়। লিফটের এ ভিডিওটী ইলিসা ল্যামের মৃত্যুর রহস্যকে আরো ঘনীভূত করে। ইলিসা বাইপোলার ডিসঅর্ডার রোগে আক্রান্ত ছিল। ইলিসা ল্যামের মৃত্যুটি রহস্যজনক অমীমাংসির কেস গুলোর মধ্যেও অন্যতম।

তথ্যসূত্রঃ **http://www.therichest.com/rich-list/10-mysterious-photos-that-cannot-be-explained/**

বিশেষ দিন

পহেলা বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। এ দিনটি বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্যাপিত হয় নববর্ষ। এদিন সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

এক সময় নববর্ষ পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির, কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর। এই কৃষিকাজের সুবিধার্থেই মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন এবং তা কার্যকর হয় তাঁর সিংহাসন-আরোহণের সময় থেকে (৫ নভেম্বর ১৫৫৬)। হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন সনটি প্রথমে ফসলি সন্ নামে পরিচিত ছিল, পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়।

বাংলা নববর্ষ পালনের সূচনা হয় মূলত আকবরের সময় থেকেই। সে সময় বাংলার কৃষকরা চৈত্রমাসের শেষদিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূ-স্বামীর খাজনা পরিশোধ করত। পরদিন নববর্ষে ভূস্বামীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এ উপলক্ষে তখন মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ক্রমান্বয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে পহেলা বৈশাখ আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে ওঠে এবং বাংলা নববর্ষ শুভদিন হিসেবে পালিত হতে থাকে।

অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁদের পুরানো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তাঁরা নতুন-পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরাচরিত এ অনুষ্ঠানটি আজও পালিত হয়।

নববর্ষের উৎসব বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত নববর্ষে তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখে, ব্যবহার্য সামগ্রী ধোয়ামোছা করে এবং সকালে স্নানাদি সেরে পূত-পবিত্র হয়। এ দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা এবং ভালো পরতে পারাকে তারা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করে। নববর্ষে ঘরে ঘরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের আগমন ঘটে। মিষ্টি-পিঠা-পায়েসসহ নানা রকম লোকজ খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায়। একে অপরের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলে। প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মাধ্যমেও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, যা শহরাঞ্চলেও এখন বহুল প্রচলিত।

চারুকলা ইনস্টিটিউট আয়োজিত শোভাযাত্রা

নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন হয়ে থাকে। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সব প্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী এই মেলায় পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজ-সজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য যেমন: চিড়া, মুড়ি, খৈ, বাতাসা, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে মেলায়। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজীর গান, আলকাপ গানসহ বিভিন্ন ধরণের লোকসঙ্গীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি আখ্যানও উপস্থাপিত হয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজেও এখন বৈশাখী মেলা বসে এবং এই মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল মিলন মেলায় পরিণত হয়। বৈশাখী মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক।

বাংলাদেশের যেসব স্থানে বৈশাখী মেলা বসে সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সাভার, রংপুরের পায়রাবন্দ, দিনাজপুরের ফুলছড়ি ঘাট এলাকা, মহাস্থানগড়, কুমিল্লার লাঙ্গলকোট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ,

মহেশপুর, খুলনার সাতগাছি, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চল, সিলেটের জাফলং, মণিপুর, বরিশালের ব্যাসকাঠি-বাটনাতলা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, টুঙ্গিপাড়া ও মুজিবনগর এলাকা। ঢাকার নিকটবর্তী শুভাঢ্যার বৈশাখী মেলা, টঙ্গীর স্নানকাটা মেলা, মিরপুর দিগাঁও মেলা, সোলারটেক মেলা, শ্যামসিদ্ধি মেলা, ভাগ্যকুল মেলা, কুকুটিয়া মেলা এবং রাজনগর মেলা উল্লেখযোগ্য। দিনাজপুরের ফুলতলী, রাণীশংকৈল, রাজশাহীর শিবতলীর বৈশাখী মেলাও বর্তমানে বিরাট উৎসবের রূপ নিয়েছে।

কালের বিবর্তনে নববর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক পুরানো উৎসবের বিলুপ্তি ঘটেছে, আবার সংযোগ ঘটেছে অনেক নতুন উৎসবের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যাহ উৎসবের বিলুপ্তি ঘটে। তখন পহেলা বৈশাখ ছিল জমিদারদের পুণ্যাহের দিন। ঢাকার ঘুড়ি ওড়ানো এবং মুন্সিগঞ্জের গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল এক সময় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। কিন্তু এদুটিসহ ঘোড় দৌড়, ষাড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, পায়রা ওড়ানো, নৌকা বাইচ, বহুরূপীর সাজ ইত্যাদি গ্রামবাংলার জনপ্রিয় খেলা বর্তমানে আর তেমন প্রচলিত নেই। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রামের বলীখেলা এবং রাজশাহীর গম্ভীরা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে নগরজীবনে নগর-সংস্কৃতির আদলে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষ উৎযাপিত হয়। পহেলা বৈশাখের প্রভাতে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় নববর্ষের উৎসব। এ সময় নতুন সূর্যকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্যানের কোনো বৃহৎ বৃক্ষমূলে বা লেকের ধারে অতি প্রত্যূষে নগরবাসীরা সমবেত হয়। নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এদিন সাধারণত সব শ্রেণীর এবং সব বয়সের মানুষ ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক পরিধান করে। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে তরুণীরা লালপেড়ে সাদা শাড়ি, হাতে চুড়ি, খোপায় ফুল, গলায় ফুলের মালা এবং কপালে টিপ পরে; আর ছেলেরা পরে পাজামা ও পাঞ্জাবি। কেউ কেউ ধুতি-পাঞ্জাবিও পরে। এদিন সকালবেলা পানতা ভাত খাওয়া একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে থাকে ইলিশ মাছ ভাজা। এভাবে লোকজ বর্ষবরণ প্রথাগুলির কোনো কোনোটির অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামীণ ঐতিহ্য অনেকটা সংরক্ষিত হচ্ছে।

বর্ষবরণের চমকপ্রদ ও জমজমাট আয়োজন ঘটে রাজধানী ঢাকায়। এখানে বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানমালা এক মিলন মেলার সৃষ্টি করে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে রমনা উদ্যান ও এর চারপাশের এলাকায় উচ্ছল জনস্রোতে সৃষ্টি হয় জাতীয় বন্ধন। ছায়ানটের উদ্যোগে জনাকীর্ণ রমনার বটমূলে রবীন্দ্রনাথের আগমনী গান্ধএসো হে বৈশাখ এসো এস্থে-এর মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করা হয়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫) ছায়ানট প্রথম এ উৎসব শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলার প্রভাতী অনুষ্ঠানেও নববর্ষকে সম্ভাষণ জানানো হয়। এখানকার চারুশিল্পীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নববর্ষের আহবানকে করে তোলে নয়নমনোহর এবং গভীর আবেদনময়। এ শোভাযাত্রা উপভোগ করে সব শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এদিন শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ, টি.এস.সি এবং চারুকলাসহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় এক বিশাল জনসমুদ্রে।

বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বি.এস.সি.আই.সি), নজরুল একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং

দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সেসব কর্মসূচিতে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য মিছিল, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি।বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন পহেলা বৈশাখের ওপর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। এছাড়া সংবাদপত্রগুলিতে বঙ্গাব্দ, নববর্ষ ও বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধসহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

বৈশাখী মেলা

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনেও পহেলা বৈশাখ এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তৎকালীন আইয়ুব সরকারের আমলে রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতার প্রতিবাদস্বরূপই বৈশাখের প্রথম দিনে ছায়ানট রমনার বটমূলে নববর্ষ পালনের আয়োজন করে। পরে ক্রমশই এ অনুষ্ঠান বিপুল জনসমর্থন লাভ করে এবং স্বাধীকার আন্দোলনের চেতনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীতির বিরুদ্ধে ও বাঙালি আদর্শের লালনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলা নববর্ষ পালিত হতে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংস্কৃতি অঙ্গনে পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। বর্তমানে বাংলা নববর্ষ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বাংলা নববর্ষ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) উপজাতীয়দের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব বৈসাবি আনন্দমুখর পরিবেশে পালিত হয়। বৈসাবি হলো পাহাড়ীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এ উৎসবকে চাকমারা বিজু, মারমারা সাংগ্রাই এবং ত্রিপুরারা বৈসুক বলে আখ্যা দিলেও গোটা পার্বত্য এলাকায় তা বৈসাবি নামেই পরিচিত। বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজু এই নামগুলির আদ্যক্ষর নিয়ে বৈসাবি শব্দের উৎপত্তি। বছরের শেষ দুদিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন এ তিনদিন মিলেই মূলত বর্ষবরণ উৎসব বিজু পালিত হয়। পুরানো বছরের বিদায় এবং নতুন বছরকে বরণ উপলক্ষে পাহাড়ীরা তিনদিন ব্যাপী এ বর্ষবরণ উৎসব সেই আদিকাল থেকে পালন করে আসছে। এ উৎসব উপলক্ষে পাহাড়ীদের বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আদিবাসী মেলার আয়োজন করা হয়।

নববর্ষের দিন মারমা উপজাতীয়রা আয়োজন করে ঐতিহ্যবাহী ওয়াটার ফেস্টিবল বা পানি খেলা। পানিকে পবিত্রতার প্রতীক ধরে নিয়ে মারমারা তরুণ-তরুণীদের পানি ছিটিয়ে পবিত্র ও শুদ্ধ করে নেয়। পাহাড়ীদের মধ্যে পানি উৎসবটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীরা বৈসাবি উৎসবকে তিনটি ভাগে পালন করে। প্রথম দিনটির নাম ফুলবিজু। এ দিন শিশুকিশোররা ফুল তুলে ঘর সাজায়। দ্বিতীয় দিনটি হচ্ছে মুরুবিজু। এদিনে হয় মূল অনুষ্ঠান। এদিন নানারকম সব্জির সমন্বয়ে এক ধরনের নিরামিষ রান্না করা হয়, যার নাম পাজন। এটি বৈসাবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্যবাহী পিঠা ও মিষ্টান্নও তৈরি করা হয়। অতিথিদের জন্য এদিন সবার ঘরের দরজা খোলা থাকে।

তথ্য সূত্রঃ **http://bn.banglapedia.org/index.php?title=পহেলা_বৈশাখ**

উদাহরণ

আহমেদ দীন রুমি

অনাদৃতা, জানো?
কালরাতে একদল কবি এসেছিলো আমার কাছে;
সুদূর ভবিষ্যৎ থেকে রবি, নজরুল
এবং জীবনবাবুর মতো গুরুগম্ভীর
অথচ প্রবল প্রেমাসক্ত একদল কবি;
চাঁদনী রাতে যেমন প্রেমাসক্ত থাকে পাষণ্ড পৃথিবী,
অতঃপর আমায় ঘিরে বসলো কবিরা,
যেভাবে ভাসানীকে ঘিরে পল্টনে জমেছিলো অজস্র মুখ।
অথচ আমার কাছে তাঁদের স্বাধিকারের দাবী নেই,
নেই অন্ন বা বস্ত্রের মতো মৌলিক আকাঙ্ক্ষা।
তাঁরা শুধুই কবিতার বিষয়বস্তু চায়,
চায় প্রেমের জন্য নতুন এবং যথার্থ উদাহরণ।
লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা
পদ্মাবতী-রত্নসেন কিংবা শাহজাহান-মমতাজ; এসবে আর কতোদিন চলবে?
পূর্বকবিদের উদাহরণ জাবর কেটে তাঁদের পোষাবে না,
নতুন কোনো ইতিহাস দরকার,
কবিতায় ব্যবহার করার জন্য সম্পুর্ণ নতুন ইতিহাস,
আরো জীবন্ত, আরো প্রেমাত্মক এবং আরো যুৎসই ইতিহাস।
তার জন্য নির্ধারিত হয়েছি আমরা দু'জনেই,
নিরেট প্রস্তাব নয়, তাঁদের চোখে মুখে ছিলো জোরালো দাবী,
তাই ফিরিয়ে দিতে পারলাম না,
আশ্বাস দিলাম, প্রেমের জন্য রক্তের শেষ বিন্দু দেবো আমি,
অনাদৃতা, ক'ফোঁটা অশ্রু দিতে পারবে না আমার জন্য?

মরণ ফাঁদ

এইচ.এম আলমগীর

সড়ক এখন মরণ ফাঁদ
সুষ্ট কাজের অভাবে ,
আর কতো মরবে যাত্রী
মরণ ফাঁদে এভাবে ?

বেহাল দশা সব সড়কে
মেরামতের চেষ্টা নাই ,
চেষ্টা যখন চলে তখন
চামচিকাদের গন্ধ পাই।

কাজের বাজেট হাওয়ায় মিলায়
টাকা খেকোদের দাপটে,
উন্নয়ন তাই চাপা পড়ে
দুঃখ জুটে ললাটে।

নিত্য দিনই মরছে মানুষ
মরণ ফাঁদের তরে ,
যাত্রীরা সব বিপদে তাই
কান্না ঘরে ঘরে।

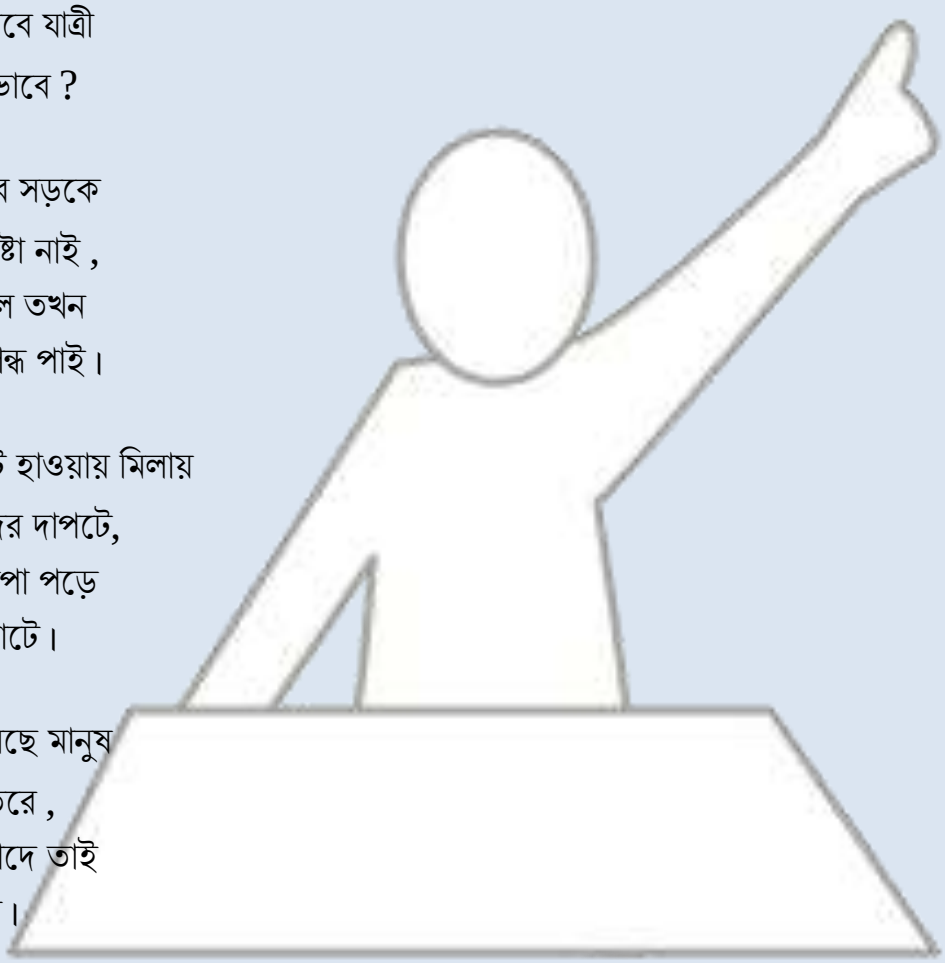

চাইনা আর জীবন হানি
চাইনা ব্যাঘাত উন্নয়নে
আসুন সবাই রুখে দাড়াই
চামচিকাদের দমনে।

চাপা কান্না

রিদওয়ান এইচ ইমন

– বাবা, আজ তো ছুটির দিন। চল না সবাই মিলে কোথাও ঘুরে আসি।

– কোন কথা না! তোমার না সামনের মাসে পরীক্ষা? কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ পড়তে বস।
– কিন্তু বাবা আজ তো বন্ধের দিন!
– তো? বন্ধ দিয়েছে বলে কি পড়াশুনা করা মানা? আর কোন কথা শুনতে চাই না। যাও!

মন খারাপ করে বাবার রুম থেকে চলে এলাম। ভেবেছিলাম বন্ধের দিনটা হৈ-হোল্লোড় আর আনন্দে কেটে যাবে। আজকের এই দিনটার জন্য গতকাল থেকে কত প্ল্যানই না করেছিলাম—সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে জলদি নাশতা সেরে সবাই মিলে ঘুরতে বের হব। কতদিন প্রাণ খুলে কোথাও ঘুরি না! তা আর হল কই! চা র দেয়ালের মাঝে আবার আটকা পড়ে গেলাম। নিজেদের জন্য বাবা-মায়ের ঢের সময়, অথচ আমার জন্য তাদের কাছে কোন সময় নেই! সবসময় সবকিছুতে বারণ—এটা করো না, ওখানে যেও না, ওসব খেয়ো না, ওদের সঙ্গে মিশবে না—আরো কত কী! গেলবার স্কুল থেকে সবাই পিকনিকে কক্সবাজার গেল। আমি বাসায় আবদার করতেই বাবার এক কথায় উত্তর, তোমার ওখানে যাওয়া মানা। তুমি সাঁতার জান না। অথচ একটিবারের জন্যও তারা আমাকে সাঁতার শিখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। আমি তো সাঁতার শিখতে চেয়েছিলাম।

সেবার গ্রামে কোন এক আত্মীয়ের বিয়েতে পরিবারের সবাই মিলে গিয়েছিলাম। নকুলদার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, গ্রাম বলে যে কিছু একখান আছে, আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ যে এইখানে থাকে, সেইটা তো ভুইলা গেছ মনে হয় হৃদম ভাই। আইছ যখন, এইবার দিন চারেক থাইকা যাও। পুস্কুনিতে সাঁতার শিখামুনে তোমারে। নকুলদার প্রস্তাবে বেশ খুশি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এইবার বুঝি সাঁতারটা আমি সত্যিই শিখতে চলেছি। কিন্তু আমার উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। সমস্ত উৎসাহে পানি ঢেলে দিয়ে বাবা বললেন, নর্দমায় সাঁতার শিখে লাভ নেই। পঁচা পানিতে সাঁতার শিখলে শরীরে নানা জীবাণু বাসা বাঁধবে। তারচেয়ে শহরে গিয়ে সুইমিং পুলে একজন দক্ষ ট্রেইনারের আন্ডারে তুমি সাঁতার শিখবে। নকুলদাকে অনেকটা অবজ্ঞা করে আমাকে বলা কথাগুলোতে যে সেদিন নকুলদা কী পরিমাণ কষ্ট পেয়েছিল তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝতে পেরেছিলাম তার ছলছল চোখ দুটো দেখে।

সেদিনের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাবার মনে আছে কী না জানি না, নাকি সাধারণ আর আট-দশটা অগুরুত্বপূর্ণ কথা ভেবে ভুলে গেছেন—তবে শহরে ফিরে আসার পরে আজ পর্যন্ত আমাকে কোন সাঁতার শিখার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়নি। একেকটা দিন একেকটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, কোনটারই কোন বাস্তবায়ন নেই। কখনো তাদের মনে করিয়ে দিলে এই বলে তারা

দায়সারা জবাব দেন, আগে পরীক্ষাটা ভালভাবে দাও, হায়েস্ট নাম্বার পাও, প্লেস কর—বাদ বাকী ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আমি একের পর এক পরীক্ষা দেই, হায়েস্ট নাম্বার পাই, প্লেসও করি...কিন্তু তবুও আমার যেন মুক্তি নেই। চার দেয়ালের মাঝেই যেন আমার বিচরণক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হতে চাওয়া যেন আমার বড় অপরাধ!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। ওটা দিয়েই বাইরের জগতটাকে যা একটু দেখা যায়। জানালাটা আছে বলেই হয়তো আমি একেবারে দুমড়ে-মুষড়ে যাই নি। ওটা আছে বলেই এখনো প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নেয়ার স্বপ্ন দেখি। জানালা দিয়ে আমি দেখি এক টুকরো আকাশ আর কিছু সাদা মেঘ। বড় ভাল লাগে। ভাবি, মেঘের সাথে আকাশটার কী গভীর মেলবন্ধন! ঈষৎ দৃশ্যমান আকাশটা এত সুন্দর, না জানি বিশাল আকাশ দেখার দৃশ্য কত সুন্দর হবে! জানালা দিয়ে সূর্য দেখা যায় না। সূর্যের ব্যাপ্তি পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তরেখা জুড়ে। আমার দক্ষিণমুখী জানালার ক্যানভাসে আলোকরাজ সূর্যের সেই জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তি ধরা পড়ে না। জানালা দিয়ে আমি কখনো কখনো আরো যা দেখি তা হল—ও বাড়ির ছাদে শুকোতে দেওয়া কোন তরুণীর নীল শাড়ি, একটা পাতলা লাল গামছা, একটা হলুদ তোয়ালে, আর কিছু ভেজা মোজা। সংসারের সমস্ত কাজের একফাঁকে হয়তো তরুণীটি পরম মমতায় নিজের কাপড় ধোয়ার পাশাপাশি স্বামীর মোজাগুলো ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে। পরদিন সকালে ধোয়া মোজাগুলো হাতে পেয়ে স্বামী যে কী পরিমাণ তৃপ্ত হবে তা ভাবতেই ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল।

সামনের দালানের ছাদের এক কোণে কিছু ফুলের উপস্থিতি দেখতে পেলাম। কী ফুল ওগুলো ? গুটি কয়েক ফুল বাদে বেশীরভাগ ফুলের নামই আমার অজানা। দূর থেকে অজানা ফুলগুলোর সুভাস ভেসে আসে। এত দূরে থেকেও সুভাস বিলিয়ে ফুলগুলোর এমন উদাত্ত আহবান, না জানি কাছে গিয়ে ওদের ছুলে কেমন স্বর্গীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে! কিন্তু আমি কাছে যেতে পারি না। আমার সমস্ত দেহই তো পরাধীনতার শৃংখলে বাঁধা। চার দেয়ালের বদ্ধ কক্ষগুলোই আমার নিয়তি।

কার্নিশে একজোড়া কবুতর দেখা যায়। হালকা কমলা রঙের চোখ দিয়ে তারা আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। হয়তো কিছু বলছে ওরা , হয়তো উপহাস করছে আমার দৈন্যতা নিয়ে। বাকবাকুম সুরে বলছে, সামান্য একটা পাখি হয়ে আমাদের এত অবাধ স্বাধীনতা, তুমি একজন মানুষ হয়েও এত পরাধীন? আমি কী করে তাদের বুঝাব এ আমার ইচ্ছে নয়! হয়তো পাখিদের সাথে মানুষের এখানেই পার্থক্য—তারা যখন ইচ্ছা যেখানে-সেখানে উড়ে যেতে পারে; আমরা মানুষরা পারি কি?

ড্রয়িং রুম থেকে হাসির শোরগোল ভেসে আসছে। হয়তো কেউ এসেছে। কাদের আসার কথা ছিল আজ? বাবা-মা কী জানতেন কেউ আজ আসবে? দরজার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। বাবার বন্ধুরা এসেছে। বাবার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলাম তার নিমন্ত্রণেই আঙ্কেল-

আন্টিরা এসেছেন। সবাইকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। মা মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য রান্না-বান্নায় লেগে গেলেন। বাবা মেতে উঠেছেন হাসি-ঠাট্টায়। তাদের আড্ডার কিছু অংশ আমার কানে ভেসে এল।

– সত্যি রফিক, কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখতে যাবার দিনগুলি আসলেই অন্যরকম ছিল, একেবারে রোমান্সে ভরপুর!
বাবার কথার পরে টাক মাথার আঙ্কেল যোগ করলেন, আর কক্সবাজারে হিমছড়ি যাবার পথে গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে হা করে বাতাস খাওয়ার কথা মনে আছে তোর? হাওয়া খেতে গিয়ে তোর মাথার ক্যাপটাই তো হাওয়া হয়ে গেছিল সেবার!—বলে আঙ্কেল হেসে উঠলেন। অমনি বাকিরাও হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। আরো কথা হয়তো তারা বলল, আমি আর দাঁড়িয়ে শুনতে পারলাম না। চুপচাপ শান্ত পায়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। কান্নায় বালিশ ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ শুনছে না আমার কান্নার শব্দ। কেউ দেখছেনা আমার কষ্টগুলো। সবাই যে যার মত মেতে আছে, আমি যেন সবার মাঝে থেকেও বড় একা, বড় শূন্য! ব্রয়লারের মুরগীর সাথে আমার কি কোন পার্থক্য আছে? এভাবে বেঁচে থাকাটাই কি জীবন?

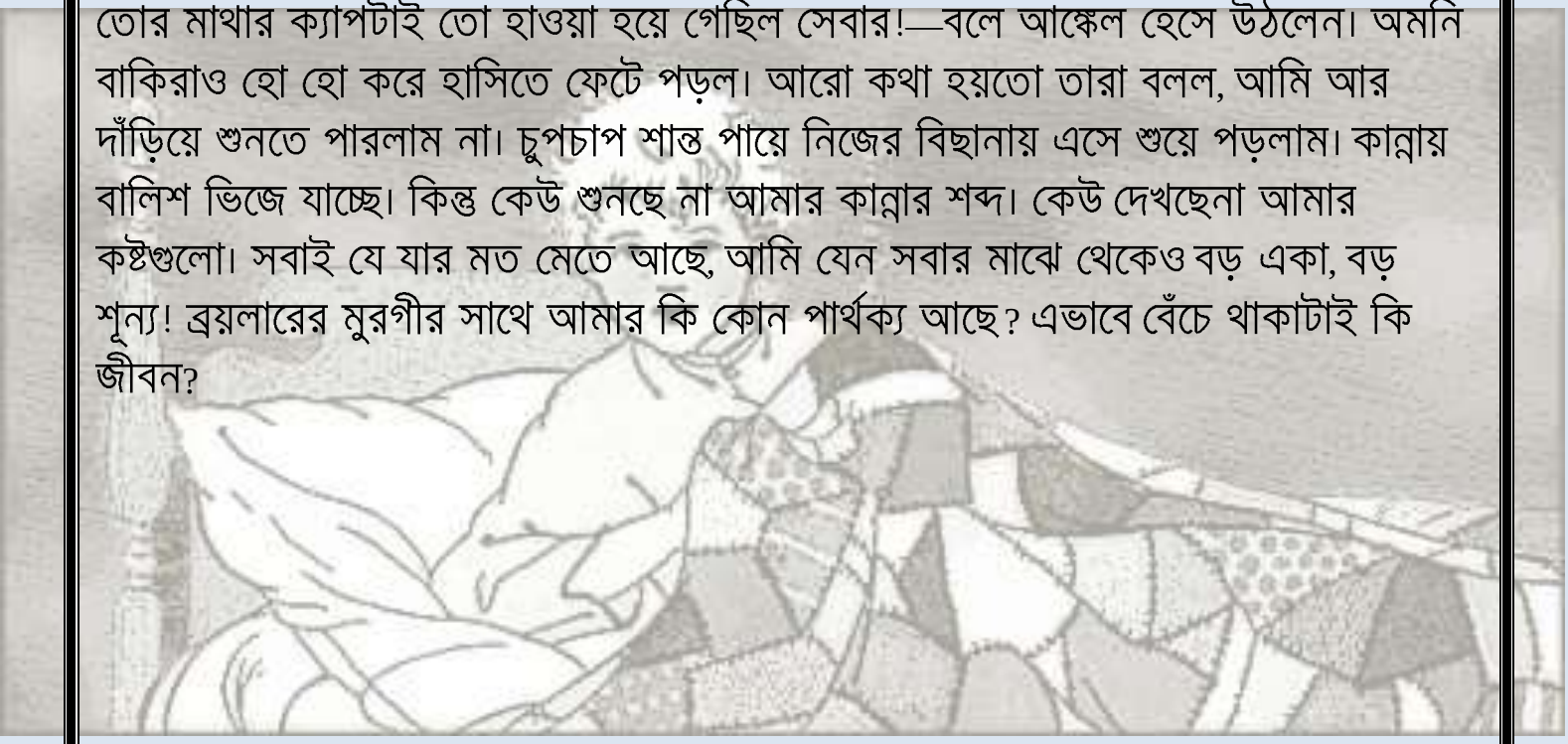

প্রেয়সীর খোঁজে

মোঃ রবিউল আওয়াল

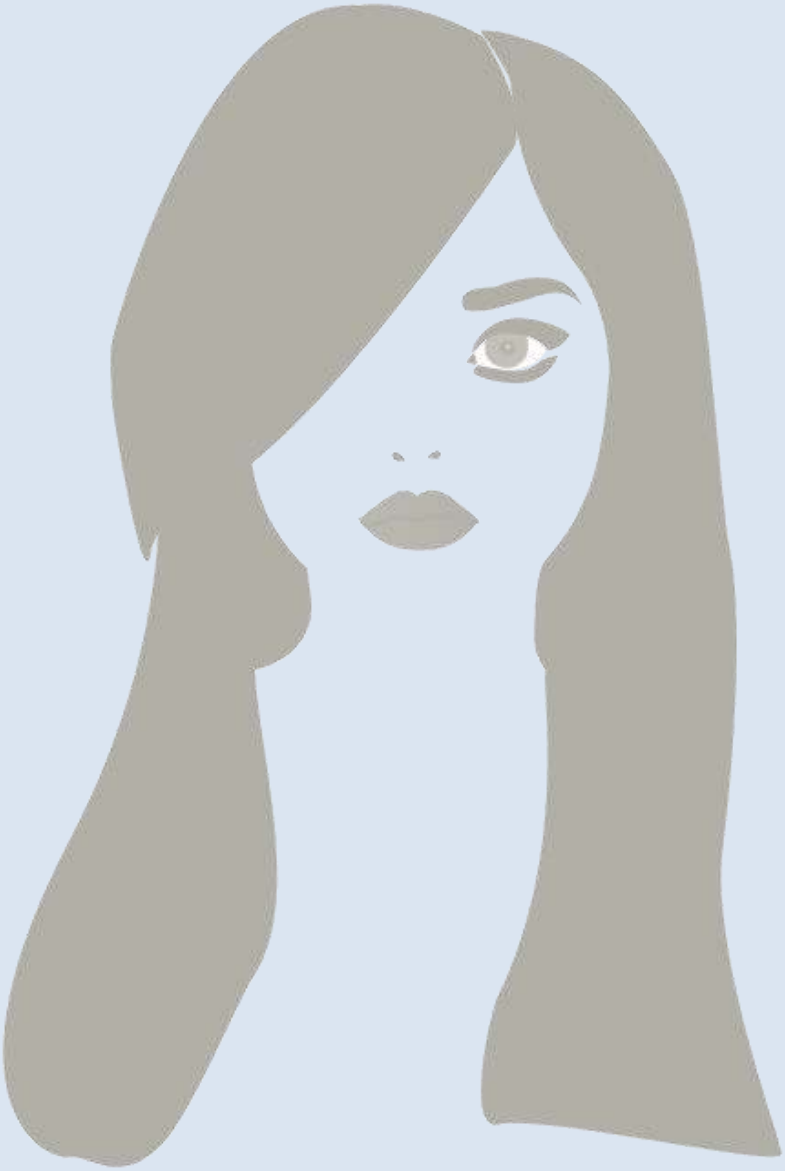

চলো বেরিয়ে পড়ি আজ
প্রেয়সীর খোঁজে
জমে থাকা মনের কথা
আধাঁরে সাজে।

চলো বেরিয়ে পড়ি আজ
ভিখারীর বেশে
দ্বারে-দ্বারে খুজে বেড়াই
ফাগুনের শেষে।

চলো বেরিয়ে পড়ি আজ
রাখালের বেশে
বাঁশির সুরে ডাকবো আমি
প্রিয়া যদি আসে!

চলো বেরিয়ে পড়ি আজ
বাউলের গানে
পথে-ঘাটে ডাকবো আমি
একতারা টানে।

"২১শে ফেব্রুয়ারী "

কৌশিক গাঙ্গুলি

একুশে মানে পদ্মা গঙ্গার পবিত্র অবগাহন
একুশ মানে বাংলা ভাষার বিজয় উদযাপন।

একুশ মানে বাংলাদেশের উজ্জ্বল শাহবাগ,
একুশ মানে ভুলে যাওয়া দুই বাংলার ভাগ।
মলিন কুয়াশা মাখা আজ আমার এই জন্মভূমি
মাযে আমার দুখিনী বর্ণমালা চরণ তোমার চুমি
আমার জীবনে শঙ্খধ্বনি, তোমার ভোরের আজান
তোমার প্রিয় রবিঠাকুর, আমার বাউলগান।
লাঠি চলেছে, চলেছে অনেক গুলি -
তবেই পেয়েছি মুখের ভাষা, কিকরে তা ভুলি।
শহিদ হয়েছিল আমার ভাই, তোমার দাদামনি
পলাশ ফুলেতে ঢেকেছিলো পথ, হৃদয় সন্ধানী।
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী
আমরা কি ভুলতে পারি ?
আমরা মাতৃভাষার জয়ধ্বনি করি।

বাংলা ভাষার বিবর্তন, শব্দভান্ডার, বৈচিত্র আর আমাদের সংরক্ষণের প্রচেষ্টা

শৌমিক কুন্ডু

পৃথিবীতে অনেক কিছুই থাকে যা আগে থেকে বলা যায়না বা বোঝা যায়না।তো এই বাক্যটার যদি এক কথায় প্রকাশ করতে বলা হয় তাহলে আমাদের অধিকাংশের মাথায় যে শব্দটা ঘুরবে তা হলো "আনপ্রেডিক্টেবল।" এখন "আনপ্রেডিক্টেবল" কথাটাকে বুঝিয়ে বলতে গেলে আমরা সবাই বলতে পারবো। যে এটা এমন কিছু যা না হবার কথা থাকলেও আকস্মিকভাবে হয়ে যায়,বা হঠাৎ মোড় ঘুরে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝাতে পারবো।কিন্তু আভিধানিক ভাবে Unpredictable শব্দটার বাংলা অর্থটা চিন্তা করতে গেলে হয়তো অন্ত:ত ১৫/২০ সেকেন্ড হলেও আমাদের মাথা চুলকাতে হবে তাই না?

মজার কথা হলো, বাংলা ভাষায় আসলে অভিধানকে টানাও ঠিক না।দৈনন্দিন ভাষার কথা চিন্তা করে দেখি,একটা বাক্যের মধ্যেই কতগুলো অনাবিধানিক শব্দ আমরা বলে থাকি।আমি ঢাকা বিভাগে থাকায় এখানকার আঞ্চলিক কথার একটা উদাহরণ টানি, "তুই ১০ টার মইধ্যে শাপলা চত্বরের সামনে আইয়া পড়িস।"

বাক্যে শব্দ আছে ৮টা।যার মধ্যে তুই, শাপলা আর চত্বর চলে গেল বিশেষ্যের কাতারে। বিশেষ্য তো যেকোন রীতিভেদে একই থাকে। আর মইধ্যে,আইয়া শব্দগুলো অভিধানে খোঁজার চেষ্টা করা বোকামি।পড়িস হয়তোবা পাওয়া যাবে কিন্তু বাক্যের এই অর্থ অনুযায়ী না, "বই পড়া" অর্থে।

এবার আরেকটা প্রসঙ্গে আসি-

যেমন- ছেলে- পোলা, পুয়া, ছাওয়াল, ব্যাটা, পুত, ছোরা, ছ্যারা।

সে- ও, ওয়, উনি, হেতে, হেয়, হেতি

রেখে- রাইক্ষা, থুইয়া

এই যে এরকম শব্দগুলোর কয়টা অভিধানে পাওয়া যাবে?বড়জোর ব্যাটা, ও,উনি এ তিনটি পাওয়া যেতে পারে।আবার এই যে আমি "অভিধান" কথাটা ব্যবহার করছি, এটা মুখে কয়জন বলি আমরা?বরং "ডিকস্নারি" বলতেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

এবার একটা অন্য উদাহরণ দেই-

আকাশ- গগন, আসমান, অন্তরীক্ষ, নভ: , দ্যু, শূন্য, অখিল, নভোমন্ডল ইত্যাদি।

আবার-

Sky- Heaven, Air, Blue, Atmosphere, Ambient, Universe.

এ জায়গায় বাংলা আর ইংরেজি মিলে গেল তো?

ওপরে "ছেলে" শব্দ দিয়ে উদাহরণ দিয়েছিলাম।

সেটাও এখন মিলিয়ে দিচ্ছি।

ছেলে- পুত্র, সন্তান, তনয়, দুলাল, আত্মজ, বংশধর।

Son- Boy, Lad, Breed, Imp, Child, Native

হা হা! এখন কেমন ওয়ার্ড মিনিং লাগছে তাই না?

পার্থক্য হলো প্রথমে উল্লিখিত ছেলের প্রতিশব্দগুলো আপনি অভিধানে খুঁজে পাবেন না, তবু আপনি জানেন, সাহিত্যেও ব্যবহার করেন,কিন্তু ইংরেজিতে মনে হয় না অভিধানের বাইরের কোনো শব্দ খুঁজে পাবেন।বাংলা ভাষার স্বকীয়তাটা এখানে, এখানে ভাষা বলতে অভিধানের প্রয়োজন হয়না।ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে বা কনভারসেশনের ক্ষেত্রে গ্রামাটিকাল ভুল ধরা হয়না বা কমিউনিকেটিভ ইংলিশকে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা তো বছর বিশেকের ঘটনা মাত্র,এ জিনিসটা আমরা মৌখিকভাবে সহস্র বছর ধরে চর্চা করে আসছি কিন্তু নিজেদের অজান্তেই,কিন্তু আজও বইয়ের পাতায় আনতে পারিনি।তবে সাধু ভাষার বদলে চলিত রীতিকে বইয়ের ভাষায় প্রচলন করতে পেরেছি এ জন্য অন্ত:ত শুকরিয়া।

হ্যাঁ,ইংরেজি ভাষারও বিবর্তন আছে। তবে সেটা অঞ্চলভিত্তিক বা জাতিভিত্তিক।

যেমন-

English- Cow/Fly/Great/Head/Sleep/Rain
Frisian (ফরাসি)- Kou/Fleane/Great/Haed/Slaepe/Rein
Dutch (ডাচ)- Koe/Vliegen/Groot/Hooft/Regen
German (জার্মান)- Kuh/Fliegen/gross/Haupt/Regen

পরিবর্তনগুলো খুবই কাছাকাছি।আবার প্রতিটি শব্দই অভিধানে আছে।সবগুলো ডাচ,জার্মান,ফরাসি ভাষায় আলাদা আলাদা অভিধানে পাওয়া যাবে।

এবার দেখা যাক যুগের সাথে বাংলা একটি অতি পরিচিত শব্দের বিবর্তন(বামে যুগ)-

হিন্দ-ইয়ুরোপায়ন- য়ূস্
শতম- য়ূস্
আর্য- য়ূস
প্রাচীন ভারতীয় আর্য -য়ূয়ম
প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য বা আদিম
প্রাকৃত- য়ূয়ংম
প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত- তুম্হে
পালি – তুমহে
গৌড়ি প্রাকৃত- তুম্হে
গৌড় অপভ্রংশ-তুম্হে
প্রাচীন যুগ-তুম্হে
সন্ধিযুগ- তুম্হি
মধ্য যুগ - তোম্হে
আধুনিক যুগ– তুমি

য়ূস্ >>>>>>>>> তুমি!!!
ভাবাই যায় না আসলে এমন বড় বিবর্তন।
তবে প্রাচ্য প্রাকৃত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিবর্তনগুলো মোটামুটি কাছাকাছিই।তবুও ছোটখাট পরিবর্তন সময়ভেদে হচ্ছে।আমরা জানি না যে পৃথিবীর আয়ু কতখানি, তাই আধুনিকায়নের হিসাবটা আমার মতে ঠিক যথাযথভাবে করা যায় না।ভাষা নিয়ে এ গবেষণাগুলো মূলত আধুনিক যুগেই করা হয়েছে। তাই আগেকার সময়গুলোকে আমরা প্রাচীন আর মধ্য ধরে নিয়েছি। বর্তমান কালটাকে যদি আধুনিক যুগ ধরে নেই, তবে আরও ৫০০/৬০০ বছর পর হয়তোবা পৃথিবী এগোবে বৈ পেছোবে না। তখন নিশ্চয়ই ভাষা নিয়ে আরও গবেষণা হবে।তো বর্তমানকালটাকে যদি আধুনিক ধরা হয় তাহলে এর পরের কালটাকে কী ধরা হবে, আর যদি ৫০০/৬০০ বছর পরের সময়টাকে সেই সময়ের আধুনিককাল ধরা হয়,তাহলে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীকে তখন কি নামে অ্যাখ্যায়িত করা হবে সেটা নিতান্তই ভাববার বিষয়।কারণ "আধুনিক" কথাটা আপেক্ষিক কেননা আধুনিকতাটা নিয়মিত পরিবর্তনশীল।

এমনকি আমাদের নিজের ভাষাটার নাম যুগ পেরিয়ে "বাংলা" থাকবে কিনা সেটাই কি আমরা নিশ্চিত হতে পারি?শুনতে অবাক লাগলেও ব্যাপারটা কিন্তু হবার মত।কারণ এখন "বাংলা" কথাটা আর বাংলা ভাষার প্রমিত বা চলিত রীতির সাথে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বাংলা কথাটিও ইতিপূর্বে বাঙ্গালা,বাঙ্গলা থেকে বিবর্তিত হয়ে "বাংলা"য় রূপ নিয়েছে। কে বলতে পারে চলিত রীতির চেয়েও সহজবোধ্য বা যুগের প্রয়োজনে অন্য কোন রীতি হবেনা?কে ই বা বলতে পারে আমাদের এই প্রিয় ভাষাটির নাম ভবিষ্যতেও "বাংলা" ই থাকবে??

এ তো গেল বাংলা ভাষার বৈচিত্রময়তা,অনিশ্চয়তা ও বিবর্তনের গল্প।
কিন্তু এখানেই যে শেষ নয়।তার প্রয়োগ পাওয়া যায় নিচের বাক্যটির দ্বারা। কিছুক্ষণ আগে ইংরেজির সাথে ফরাসি, জার্মান আর ডাচ ভাষার তুলনা করছিলাম।
এখন বাংলাদেশে প্রচলিত একটি বাক্যের অঞ্চলভিত্তিক রূপ দেখে নিই-

প্রমিত- একজন মানুষের দুইটি ছেলে ছিল।
ঢাকা- একজন মাইনষের দুইডা পোলা আছিলো।
চট্টগ্রাম-ঔগ্গোয়া মাইনষ্যের দুয়া পুয়া আছিল্।
সিলেট-এক মানশের দুই পোয়া আছিল্।
নোয়াখালী-একজন মাইনহের দুই হুত্ আছিল্
রংপুর-একজন মানষের দুইক্না ব্যাডা আছিল্।

এখন শুধু ইংরেজি Cow(কাউ) শব্দটা বিবেচনা করি।যাকে ফরাসিতে Kou(কউ), ডাচে Koe(কোয়ে), জার্মানে Kuh (কুহ্) বলা হয়। এগুলো ইংরেজির বিবর্তন হলেও প্রত্যেকটিই কিন্তু স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে এবং তাদের অভিধানও আছে।কিন্তু বাংলার দু:খের জায়গাটা এখানে।বাংলা প্রমিত রীতিটাকে স্ট্যান্ডার্ড বা এককের মত ধরে নিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে কেউ বলে বিকৃত রূপ, কেউ বলে উপভাষা।কিন্তু সেগুলোকে কেউ আলাদা ভাষার মর্যাদা দেবার কথা চিন্তা করেনি।তাহলে চিন্তা করা যায়, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ এই ছোট্ট এলাকার একটি প্রচলিত ও বিশ্বের বুকে ভাষাভাষীর দিক থেকে চতুর্থ এই ভাষাটির কি

পরিমাণ শব্দভান্ডার হত?ওদের যদি ডাচ, জার্মান, ফরাসি ভাষার অভিধান থাকতে পারে, আমাদেরও সিলেটি, চাঁটগাঁইয়া, ঢাকাইয়া, বরিশাইল্যা, নোয়াখাইল্যা ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান থাকতে পারে।কেন পারেনা?বরং সেটা আরও গর্বের বিষয় যে একটা দেশেই কিছু অঞ্চলে এত রকম স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে!

"কাউ" কে "কউ","কোয়ে", "কুহ্" বললে তার যদি প্রত্যেকটা আলাদা ভাষার মর্যাদা পায়, তবে "দুইটা"কে "দুইডা","দুয়া","দুইক্কা" কেন নয়? "পোলা","পুয়া","পোয়া" কেন নয়? তাহলে আলাদা দেশ না হয়েও আমাদের মুখে মুখে শুধু প্রচলিত না হয়ে ভাষাগুলোর থাকতো স্বতন্ত্র মর্যাদা। ভাষাগুলোর নামও আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা হতো না,বরং স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হতো।

ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক আগে দু:খ করে গিয়েছিলেন, একসময় আমাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য মা-দাদীরা যেসব ভূত-প্রেতের কিচ্ছা বলতো,দু'চার লাইনের ছড়া বা যেসব প্রবাদ বাক্য বলতো সেসব বইয়ের পাতায় অমর করে রাখলে ভলিউম ভলিউম বই বের করা যেতো।

এখন সাহিত্য লেখা হয় ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বা পেজে।সেসব নিয়ে যদি কারো স্ট্যাটাস সংকলন বের করা হয়, তা যেমন সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে আবার মানুষের সমালোচনামূলক লেখাগুলো থেকে বেরিয়ে আসবে দেশকে এগিয়ে নেবার অনেক ক্রিয়েটিভ আইডিয়া, ট্রল বা রম্যভিত্তিক যে পেজগুলো আছে তাদের সংরক্ষিত লেখাগুলো বইয়ের পাতায় নি:সন্দেহে জোক্স বা কৌতুকের রসদ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের চেয়েও এক্ষেত্রে আমার যোজন যোজন এগিয়ে থাকবো, এদেশের মানুষের একটি বড় অংশের ধারণা এই যে ইন্টারনেট মানেই ফেসবুক।তবে এটিকেও তো চাইলে ফলপ্রদ করা যায়।কেউ যদি বই না বের করতে চায় মানে ছাপতে না চায়, তাতেও তো এখন সমস্যা নেই।ই-বুক আছে, অনলাইন ম্যাগাজিন আছে, এগুলোই হতে পারে সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার।ডাউনলোড করতেও এখন আর ডাটা চার্জ লাগেনা অনেক ক্ষেত্রে, আছে ওয়াইফাই নামক বিস্ময়, আর বইয়ের চেয়ে এখন apk অ্যাপ আকারেই বানানো যায় ভালো অভিধান।এমনকি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সেই শত বছরের আগের ইচ্ছা পূরণ করাটাও এখন আর কঠিন কিছু না,এখনও আমাদের নানী-দাদীদের সেসব কিচ্ছার বিরাট একটা অংশ মনেই আছে, আমরাও ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি শুনেই ঘুমাতাম বছর বিশেক আগেও।এখন শুধু সেগুলো কী বোর্ডে টাইপ করা বাকি।শুধু প্রয়োজন একটু প্রচেষ্টার, নিজেদের স্বকীয়তাকে বিশ্ব দরবারে উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা।হবে হবে করে সেটাই কখনো হয় না,সারাবছরের হজম হওয়া জিনিসগুলো চেতনা আকারে শুধু একুশ এলে উদগীরণ করা হয়।

হৃদয়ের গোপনে

অচেনা পথিক

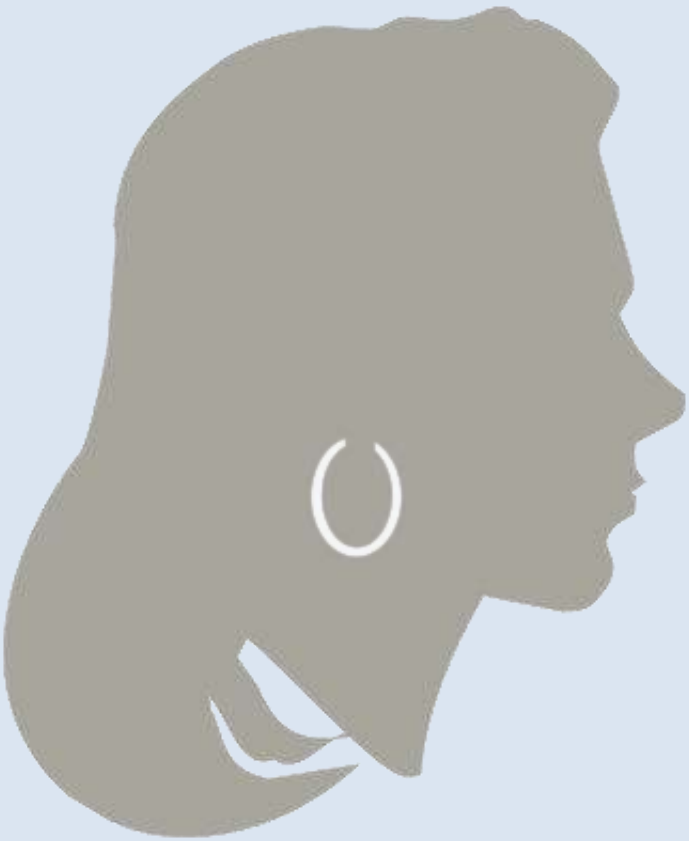

আজ তুমি চোখের আড়াল ,
গান তাই ভুলে গেছে সুর
অন্ধকারে খুঁজি তোমায়
তুমি যে আজ বহুদূর।
পথ শেষ চলার ....দুজনে
ভুলে যাই বারবার তোমায় ,পারি না
তুমি যে রয়েছো হৃদয়ের গোপনে।

স্মৃতির পাতায় আজও স্বপ্নরা
দেখো খেলে যায় ,
চোখ বন্ধ করলে আজও মন
তোমাকেই দেখতে যে পায়।
কতো কথা বলি আজ আনমনে,
হটাৎ কেন এসেছিলে আমার জীবনে ?
ভালবাসা আছে আজও ,
শুধু অনুভূতি গুলি নীরব ,
কথা ছিলো এক সাথে পেরোবো ছায়াপথ।
গোপালের কাঁটায় বিঁধে গেছে আসা,
চাতকের মতো খুজে মন আজ ভালবাসা।
ব্যস্ত জীবন ,একলা এ মন
ডায়রী খাতায় ,আঁকে ছবি তোমার ,
আয়না ভাঙ্গে কতো
আলোআঁধারে তোমার প্রতিচ্ছবি
ভেসে আসে যে বারবার।
কবিতা যে ছন্দহীন ,সুর নেই যে আজ গানে ,
ভুলে গেছি তোমায় আমি কতো বার
তবুও আছো তুমি আমার হৃদয়ে
আজও গোপনে

লেখক পরিচিতি

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

জীবনী

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট বর্তমান ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি তার পরিবারের সাথে কলকাতা হতে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্থানান্তরিত হন। তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে দু'বার বিয়ে করেন: ১৯৬১ সালে সুমিতা দেবীকে এবং ১৯৬৬ সালে তিনি সুচন্দাকে বিয়ে করেন, দুজনেই ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী।

কর্মজীবন

জহির রায়হান বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। ১৯৫০ সালে তিনি যুগের আলো পত্রিকায় সাংবাদি ক হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি খাপছাড়া, যান্ত্রিক, সিনেমা ইত্যাদি পত্রিকাতেও কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি সম্পাদক হিসেবে প্রবাহ পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ সূর্যগ্রহণ প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্র জগতে তার পদার্পণ ঘটে ১৯৫৭ সালে, জাগো হুয়া সাবেরা ছবিতে সহকারী হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে। তিনি সালাউদ্দীনের ছবি যে নদী মরুপথেতেও সহকারী হিসেবে কাজ করেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এহতেশাম তাকে এ দেশ তোমার আমার এ কাজ করার আমন্ত্রণ জানান; জহির এ ছবির নামসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি রূপালী জগতে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন কখনো আসেনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র সঙ্গম নির্মাণ করেন (উর্দু ভাষার ছবি) এবং পরের বছর তার প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র বাহানা মুক্তি দেন। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক আমতলা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ভাষা আন্দোলন তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তার বিখ্যাত চলচ্চিত্র জীবন থেকে নেওয়া"তে। তিনি ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন।[১] কলকাতায় তার নির্মিত চলচ্চিত্র জীবন থেকে নেওয়ার বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয় এবং চলচ্চিত্রটি দেখে সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা এবং ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ ভূয়সী প্রশংসা করেন। সে সময়ে তিনি চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ তিনি মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন।[২]

অন্তর্ধান ও মৃত্যু

জহির রায়হান দেশ স্বাধীন হবার পর তার নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে শুরু করেন, যিনি স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে পাকিস্তানী আর্মির এদেশীয় দোসর আল বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন। জহির রায়হান ভাইয়ের সন্ধানে মীরপুরে যান এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি। মীরপুর ছিল ঢাকা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত বিহারী অধ্যুষিত এলাকা এবং এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সেদিন বিহারীরা ও ছদ্মবেশী পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশীদের ওপর গুলি চালালে তিনি নিহত হন।

পরিবারের উল্লেখযোগ্য সদস্য

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ জহির রায়হানের দুই স্ত্রী 'র একজন সুমিতা দেবী। এই প্রয়াত অভিনেত্রীর দুই ছেলে বিপুল রায়হান ও অনল রায়হান। দুজনেই প্রতিষ্ঠিত নাট্য নির্মাতা। আরেক স্ত্রী সুচন্দা'র ছোট ছেলে তপু রায়হানও অভিনেতা। তিনি 'সবুজ কোট কাল চশমা' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। জাহির রায়হানের ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের মেয়ে শমী কায়সার।[৩]

জীবনপঞ্জি

১৯৩৫: জন্ম ১৯ আগস্ট, মজুপুর গ্রাম, ফেনী।
প্রাথমিক লেখাপড়াঃ মিত্র ইন্সটিটিউট, কলকাতা।
আলিয়া মাদ্রাসা, কলকাতা।
১৯৪৯: নতুন সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা) -য় ওদের জানিয়ে দাও শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত।
১৯৫০: আমিরাবাদ হাইস্কুল (ফেনী) থেকে মেট্রিক পরীক্ষা।
১৯৫১-১৯৫৭: কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি জড়িত।
১৯৫২: : ছাত্র অবস্থাতেই মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহন।
মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ থেকে জহির রায়হানে পরিণত।
প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুল (কলকাতা)-য় ভর্তি।
১৯৫৩: জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা) থেকে আই.এস.সি পরীক্ষা।
১৯৫৬-১৯৫৮: কোর্স শেষ না করেই চিকিৎসাশাস্ত্র (মেডিক্যাল কলেজ) ত্যাগ।
১৯৫৬: পাকিস্তানের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক জারদরি-এর সহকারী মনোনীত হয়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ।
১৯৫৮: : বি.এ.অনার্স (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
পঞ্চাশের দশকে ছাত্র অবস্থায় প্রথম গল্পগ্রন্থ সূর্য গ্রহণ প্রকাশিত।
১৯৬১: : প্রথম চলচ্চিত্র কখনো আসেনির মুক্তি লাভ।
চিত্রনায়িকা হেনা লাহিড়ী সুমিতা দেবীর সাথে পরিণয়।
পাকিস্তানের প্রথম রঙ্গিন ছবি সঙ্গম (উর্দু ভাষায়) তৈরি।
১৯৬৪: হাজার বছর ধরে উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ।

১৯৬৮: চিত্রনায়িকা কোহিনূর আকতার সুচন্দার সাথে পরিণয়।
১৯৭০: পাকিস্তানের প্রথম রাজনৈতিক-চেতনামন্ডিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' মুক্তিলাভ।
১৯৭১: : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ।
মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রথম চলচ্চিত্র স্টপ জেনোসাইড নির্মাণ।
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দ্বিতীয় চলচ্চিত্র এ স্টেট ইজ বর্ন নির্মাণ।
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র ইনোসেন্ট মিলিয়ন (পরিচালকঃ বাবুল চৌধুরী) এবং লিবারেশন ফাইটার্স (পরিচালকঃ আলমগীর কবীর)-এর তত্ত্বাবধান।
বুদ্ধিজীবীদের বাংলাদেশ মুক্তি পরিষদ (Bangladesh Liberation council of Intelligentsia)-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।
১৯৭১: সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৭২ সালে ঘোষিত)
১৯৭২: বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি গঠন।
১৯৭২: নিখোঁজ (৩০ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত)।
১৯৭৭: চলচ্চিত্র শিল্পে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় একুশে পদক লাভ।
১৯৯২: সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ।

পুরস্কার

আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬৪। (হাজার বছর ধরে)
নিগার পুরস্কার ('কাঁচের দেয়াল') চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে।
বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৭১। (উপন্যাসঃ মরণোত্তর)
একুশে পদক ১৯৭৭। (চলচ্চিত্রঃ মরণোত্তর)
স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ১৯৯২। (সাহিত্যঃ মরণোত্তর)

উল্লেখযোগ্য কাজ
উপন্যাস
শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০) প্রথম উপন্যাস। প্রকাশকঃ সন্ধানী প্রকাশনী। রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান।
হাজার বছর ধরে (১৯৬৪) আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত আখ্যান। (চলচ্চিত্ররূপ, ২০০৫)
আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯) বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কথামালা।
বরফ গলা নদী (১৯৬৯) প্রথম প্রকাশঃ 'উত্তরণ' সাময়িকী। অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায়ত্ব গাঁথা।
আর কত দিন (১৯৭০) অবরুদ্ধ ও পদদলিত মানবাত্মার আন্তর্জাতিক রূপ এবং সংগ্রাম ও স্বপ্নের আত্মকথা।
কয়েকটি মৃত্যু
একুশে ফেব্রুয়ারী (১৯৭০)
তৃষ্ণা (১৯৬২)

গল্পসমগ্র
সূর্যগ্রহণ প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৩৬২ বাংলা, সোনার হরিণ, সময়ের প্রয়োজনে, একটি জিজ্ঞাসা, হারানো বলয়, বাঁধ, নয়াপত্তন, মহামৃত্যু, ভাঙাচোরা, অপরাধ, স্বীকৃতি, অতি পরিচিত,

ইচ্ছা অনিচ্ছা, জন্মান্তর, পোস্টার, ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি, কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ, কয়েকটি সংলাপ (১৯৭১), দেমাক, ম্যাসাকার, একুশের গল্প

অন্যান্য রচনা

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (প্রবন্ধ), কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'পরিচয়' সহিত্যপত্রের বাংলাদেশ সংখ্যায় (জুলাই ১৯৭১) এ প্রকাশিত হয়।

অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ) , সোভিয়েত বিপ্লবের ৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব উদযাপন কমিটির (ঢাকা) স্মরণিকা 'তরঙ্গ'-এ (নভেম্বর ১৯৬৭) প্রকাশিত হয়।

ওদের জানিয়ে দাও (কবিতা)

জহির রায়হান রচনাবলী- ১ম খণ্ড

জহির রায়হান রচনাবলী-২য় খণ্ড

পত্রিকা সম্পাদনা

এক্সপ্রেস (ইংরেজি সাপ্তাহিক)

প্রবাহ (বাংলা মাসিক)

চলচ্চিত্র

সহকারী পরিচালক হিসেবে

জাগো হুয়া সাবেরা (১৯৫৯)

এদেশ তোমার আমার (১৯৫৯)

নবারুণ (১৯৬০)

যে নদী মরুপথে (১৯৬১)

পরিচালক, প্রযোজক, লেখক ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে

বছর	চলচ্চিত্র	ভাষা	নোট	পরিচালক	প্রযোজক	চিত্রনাট্য	লেখক
১৯৬১	কখনো আসেনি	হ্যাঁ		হ্যাঁ	হ্যাঁ	বাংলা	পরিচালক হিসেবে প্রথম চলচ্চিত্র
১৯৬২	সোনার কাজল	হ্যাঁ				বাংলা	কলিম শরাফী এর সাথে যৌথভাবে পরিচালনায় নির্মিত।
১৯৬৩	কাঁচের দেয়াল	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বাংলা	

১৯৬৪	সংগম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উর্দু	সমগ্র পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম রঙ্গীন চলচ্চিত্র।
১৯৬৫	বাহানা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উর্দু	সমগ্র পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র।
১৯৬৫	একুশে ফেব্রুয়ারী	হ্যাঁ				বাংলা	অপ্রকাশিত
১৯৬৬	বেহুলা	হ্যাঁ		হ্যাঁ		বাংলা	
১৯৬৭	আনোয়ারা	হ্যাঁ		হ্যাঁ		বাংলা	
১৯৬৮	দুই ভাই		হ্যাঁ	হ্যাঁ		বাংলা	
১৯৬৮	কুচবরণ কন্যা		হ্যাঁ			বাংলা	
১৯৬৮	জুলেখা		হ্যাঁ			বাংলা	
১৯৬৮	সুয়োরাণী-দুয়োরাণী		হ্যাঁ			বাংলা	
১৯৬৮	সংসার			হ্যাঁ	হ্যাঁ	বাংলা	
১৯৬৯	মনের মত বউ		হ্যাঁ			বাংলা	
১৯৬৯	শেষ পর্যন্ত		হ্যাঁ			বাংলা	
১৯৭০	জীবন থেকে নেয়া	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বাংলা	
১৯৭০	টাকা আনা পাই			হ্যাঁ		বাংলা	
১৯৭০	লেট দেয়ার বি লাইট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, রুশ	অসমাপ্ত। চলচ্চিত্রটি সমাপ্ত হবার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু

							হয়।
১৯৭১	জলতে সুরজ কে নীচে			হ্যাঁ		উর্দু	
১৯৭১	স্টপ জেনোসাইড	হ্যাঁ		হ্যাঁ		ইংরেজী	তথ্যচিত্র
১৯৭১	বার্থ অব আ নেশন / এ স্টেট ইজ বর্ন	হ্যাঁ		হ্যাঁ	হ্যাঁ	ইংরেজী	তথ্যচিত্র
১৯৭১	চিলড্রেন অব বাংলাদেশ	হ্যাঁ		হ্যাঁ	হ্যাঁ	ইংরেজী	তথ্যচিত্র
১৯৭১	সারেন্ডার	হ্যাঁ		হ্যাঁ	হ্যাঁ	ইংরেজী	তথ্যচিত্র
১৯৭২	প্রতিশোধ		হ্যাঁ			বাংলা	
১৯৭৩	ধীরে বহে মেঘনা					বাংলা	মূল পরিকল্পনা
২০০৫	হাজার বছর ধরে				হ্যাঁ	বাংলা	
২০১৪	পোস্টার				হ্যাঁ	বাংলা	স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

বৃদ্ধা এক

এইচ.এম আলমগীর

বয়স আশি বৃদ্ধা এক
আয়নায় দেখছে মুখ,

ললাট গেছে কুচকে
গহিন হয়েগেছে চোখ।

গাল দু- খানি গেছে ঝুলে
নেই আবার বহু দন্ত,

কেশ তার হয়েছে পাট
যেনো আজ নয় জীবন্ত।

হস্তের পিঠে হস্ত রেখে
চমকে উঠেছে মন,

খসখসে হয়েছে ত্বক
মসৃনতা নেই এখন।

উত্তেজনার বক্ষ তাঁর
পড়েছে হায় ঝুলে,

দেখতে চাইত যা সবে
লাজ্জ সরমরে ভুলে।

হঠাৎ নাতনীর প্রবেশ
হস্ত রাখে মুখো পানে,

মুক্তা দন্ত করে বের
হাসছে সে আনমনে।

হাওয়াতে উড়ছে কেশ
বক্ষে বহে আকর্ষণ,

মসৃন কোমল ত্বক তার
উত্তেজনা আনবে গোপন।

বৃদ্ধা তখন অস্রু ঝরান
চেয়ে থাকেন অমনি,

তুমার মত ছিলাম
আমিও যৌবনা রমনি।

বহু প্রেম দিয়েছি ফিরিয়ে
অহঙ্কারের ছলে,

আসবে কি সে? যে মোরে
বেঁদেছে কবিতার আচলে।

যে কবি এ ওষ্টে খোঁজতো
রাত্রির শেষেতে ঊষা,

সুখকে যে বলতো দুপুর
দুঁঃখকে বলতো কুয়াশা।

আমায় নিয়ে লিখে কবিতা
সে আজ মস্ত বড় কবি,

হাজারো কবিতা প্রেমিক
মনে এঁকেছে তার ছবি

তাহার কবিতাতেই আমি
কখনো কি কেউ বলবে?

একলা মন প্রেম আগুনে
জ্বলবে শুধুই জ্বলবে।

অনিশ্চিত যাত্রা কেন

নাসিম আহমদ লস্কর

মহাকালের পথিক তুমি,আমি,সে,আমরা,তোমরা
প্রান্তিক-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত সকলেই।
অনিশ্চিত যাত্রা আমাদের।

চিরকাল নিশ্চিন্তে দিনাতিপাতের আশায়
অস্বস্তির পোটলা হৃদয়ে বেঁধে হেটেই চলি।
সংসার সমরাঙ্গনে কোথায় একটু বটের ছায়া মিলবে
সেই জন্যেই তো এত আকুলি বিকুলি।

উদাসি জীবনে বেমালুম বিষণ্নতাকে পেছনে ফেলে
কেনইবা কোলেপিঠে এত ভার নিয়ে সামনের দিকে দুর্বার যতিহীন গতিতে এগিয়ে চলি!

কোন সুখ পাখির ডাকে স্ত্রী,পুত্র নিয়ে সংসার সাজাই?
কোন সে লোভের টানে অকূল পাথারে মুক্তা আনতে যাই?

অন্ধকার জীবনে আলোর জন্য এত ছটফটানি!
নিশ্চিন্তের আশায় কেন অনিশ্চিতের পথে যাত্রা আমাদের?

হায়রে!বোকা মানবকূল।

আবার

ইখতিয়াক ইফাত

হাফিজ সাহেব চেয়ারে বসে আছেন। তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। তার সামনের চেয়ারে আরেকজন বসে আছেন। যে বসে আছে তার কিছু একটা ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না। লোকটি দেখতে সাধারন মানুষের মতোই। কোন বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না তাকালে। তবে ইনি একজন খুনি। কিন্তু অবাক বিষয় হলো খুন করার পর তিনি নিজেই থানায় ফোন করেছেন। ফোন করে জানিয়েছেন যে তিনি একটা খুন করেছেন। লাশ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আনা হয়েছে থানায়। হাফিজ সাহেব এই কেসের তদন্ত কর্মকর্তা। তিনি এখন খুনের ব্যাপারে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বসেছেন।

-কি নাম আপনার?

-রহিম শেখ।

-তো রহিম শেখ, আপণিই খুন করেছেন?

-জ্বি।, বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল রহিম শেখ।

হাফিজ সাহেব ভ্রু কুচকে তাকালেন। ২০ বছর ধরে পুলিশে কাজ করছেন তিনি। কিন্তু এতো স্বাভাবিক ভাবে কখনো কোন খুনি কে খুন করার কথা স্বীকার করতে দেখেন নি তিনি।

-যাকে খুন করেছেন তিনি আপনার কি হয়? , বলে উঠলেন হাফিজ সাহেব

-আমার বন্ধু।

-কেন খুন করেছেন?

-জানি না

হাফিজ সাহেবের ভ্রু আরেকটু কুচকে গেল। তিনি আরেকটু ভালো করে রহিম শেখের উপর তাকালেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলেন আরেকবার। সব কিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু একটা ঠিক লাগছে না। কিন্তু সেটা কি তা তিনি বুঝতে পারছেন না। হাফিজ সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন,

-আপনি খুন করেছেন আর আপনি জানেন না কি কারনে খুন করেছেন ?

-না, কিন্তু ওর চোখ দুটো ...

- ওর চোখ দুটো কি?

-কিছু একটা ছিলো ওর চোখে। অশুভ কিছু একটা।

- কি অশুভ কিছু?

- জানি না। শুধু মনে হলো খুব অশুভ। যা সব কিছু শেষ করে দিবে। সব নষ্ট করে দিবে। ওর চোখ দুটো ভয়ংকর হয়ে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো এক্ষুনি ঝাপিয়ে পড়বে আমার উপর।

হাফিজ সাহেব কিছুটা অবাক হয়ে তাকালেন।

-তারপর কি হয়েছিলো?

-মনে হচ্ছিলো ওর চোখ দুটোকে একেবারে বন্ধ করতে হবে। নাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। পুরো পৃথিবী উলটে যাবে। সব কিছু যেন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি কিচ্ছু বুঝছিলাম না। শুধু বুঝছিলাম ওকে শেষ করতে হবে। ওকে খুন করতে হবে। তারপর রান্নাঘর থেকে ছুরিটা এনে ওর দুই চোখে ঢুকিয়ে দিলাম। এ কবার, দুইবার, হাজারবার।

হাফিজ সাহেব ঘটনা এখনো ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপাতত সব শুনে মনে হচ্ছে রহিম শেখের মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই। কিন্তু কিছু একটা ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না। হাফিজ সাহেব আবার রহিম শেখের দিকে তাকালেন। এইবার অস্বাভাবিকতাটা ধরতে পারলেন তিনি। অস্বাভাবিকতাটা রহিম শেখের চোখে। রহিম শেখের চোখটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিছু একটা অশুভ লুকিয়ে আছে তার চোখে। সাধারন অশুভ কিছু নয়, ভীষণ অশুভ। হাফিজ সাহেব বুঝে গেছেন এ চোখকে আর রাখা যাবে না। কিছুতেই রাখা যাবে না। এ চোখকে ধ্বংস করে দিতে হবে। না হলে সব শেষ হয়ে যাবে। পুরো পৃথিবী নষ্ট হয়ে যাবে। হাফিজ সাহেব কিছুতেই তা হতে দিতে পারেন না। তাকে এক্ষুনি এ চোখ কে ধ্বংস করে দিতে হবে। পুরো পৃথিবীকে রক্ষার দায়িত্ব এখন তার। হাফিজ সাহেব তার কোমরের খাপ থেকে রিভালভারটা বের করে আনলেন। রিভালভারটার কালো নল রহিম শেখের অশুভ চোখের দিকে তাক করে ধরলেন। এ অশুভ চোখকে তিনি কিছুতেই বাচতে দিবেন না।

// আত্ম সুখ //

অতনু নন্দী

উদাস চিও মাঝে ভাবি অহরহ
জন্মেছি যখন একটা দাগ রেখে যাব।
জীবনের খেলাঘরে
ধন্ধরা জড়িয়ে ধরে,
দুবেলা মহা সমারোহে আহার
আধুনিক ফ্ল্যাট ও বাগান বাড়ি
রাস্তার ধুলো পায়ে মাখি না ,
সওয়ারি আমার বিলাস বহুল গাড়ী।
চিও মাঝে ধন্ধ জন্মায়
বেশ আছি রসে বসে,
সমাজ জ্বলছে জ্বলুক
অনাহারে মানুষ মরুক,
আমি তো দিব্যি আছি আত্ম সুখে
কাটছে দিন ভোগ বিলাসে।
বামা মাকে করে পরবাসী
আত্ম সুখে অণু পরিবারে মাতি।
দেশ দশ পাড়া ভুলে
রাজনীতি আর আমিত্বকে
করেছি সাথি।
কোলাহল ব্যস্ততা মাঝে
চিত্তের সাগরে ধন্ধে ডুবে মরি;
কালের করাল নিয়মে আরও.. আরও...
আধুনিক হব আমারা।
আমার ছেলে সে দিন
আমাকেও কি করবে পরবাসী ?
ভোগের মাঝে আত্মসুখের বিছানায়
কাটিয়েছি জীবন ,
অমৃতের সন্ধানে পারী দেব যখন
পড়ার লোকেরা হরিবোল ধ্বনি
শোষ যাত্রার করবে তো আয়োজন ?

== জ্বর জাগানিয়া==

হৃদয় লোহানী

তুমিই প্রথম প্রকাশ্যে - - -

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই- তুমিই প্রথম প্রকাশ্যে- এক নিমিষেই

চেপে পিষে ভেঙ্গে চূড়ে ঢুকে বেরিয়ে ভিজিয়ে গলিয়ে

আমাকে ভোগ করলে তুমি

তুমিই প্রথম প্রকাশ্যে গোলক ধাঁধায় কানামাছি খেলে খেলে

ভরত নট্যাঁমে মুগ্ধ করেছিলে

তুমিই প্রথম প্রকাশ্যে কুঁচিপুড়ি অন্দ্রপ্রদেশের-

খোলা আকাশের নীচে বর্ণ গন্ধসমেত চুমু রেখেছ

তুমিই প্রথম প্রকাশ্যে- - -

ডালহৌসই- ধরমশালায়- শিলং দার্জিলিং -এ

ঘুমের সাধে বিস্ময় মেখেছো

আরোগ্যের একমাত্র অবিশ্রাম সম্পর্কে

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই-

একমাত্র প্রকাশ্যে প্রথম...

জরাজীর্ণ বৃক্ষ

আব্দুল মান্নান মল্লিক

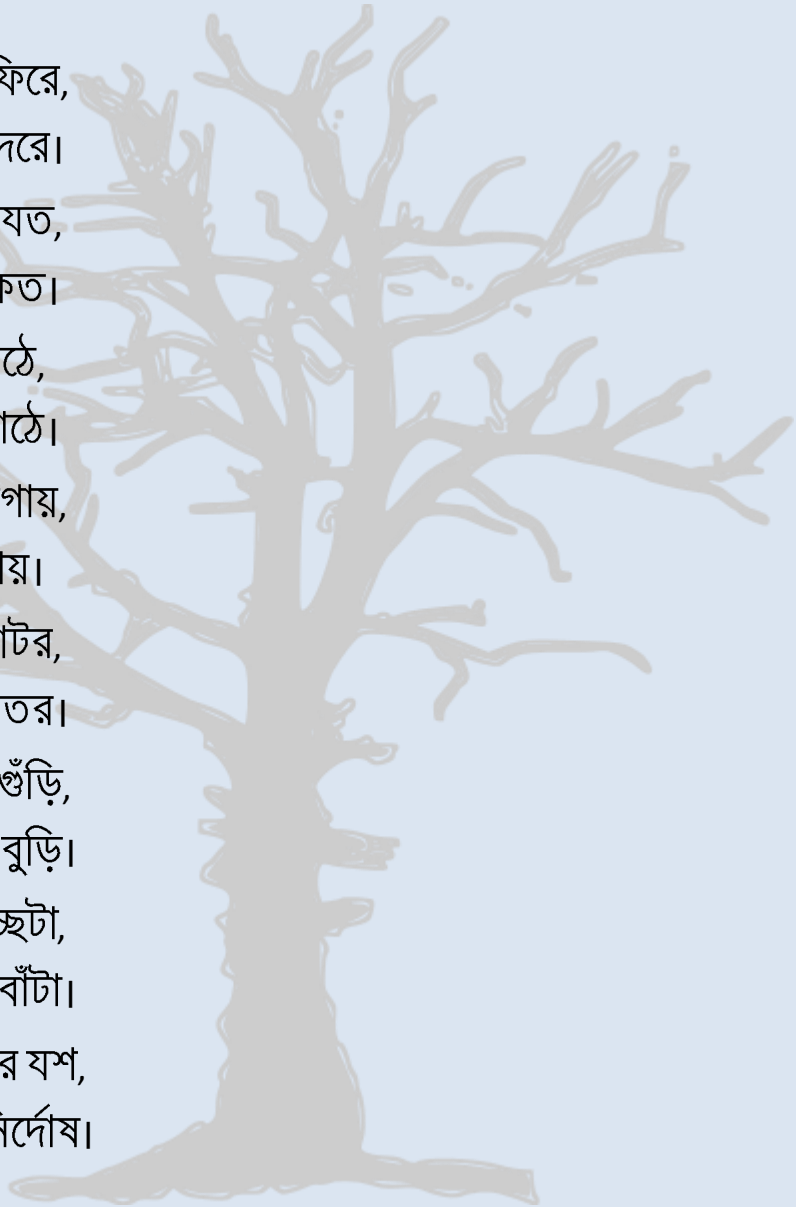

অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে, চাহেনা কেহই ফিরে,
অবজ্ঞায় দাড়িয়ে আছে, সবার অনাদরে।
এখনও আছে কতক, গাঁয়ের প্রবীন যত,
বলিতে পারেনা কেহ, বৃক্ষের বয়স কত।
জরাজীর্ণ রোগাগ্রস্ত, নির্জনে মাঝ মাঠে,
আংশিক তাজা বৃক্ষ, বাকিটা শুস্ক কাঠে।
কাঠঠোকরার ঠোকাঠুকি, জীর্ণ কাষ্ঠগায়,
বৃক্ষছালের পোকাগুলো, ধরে ধরে খায়।
চঁচুর আঘাত দিয়ে, করিছে বৃক্ষে কোটর,
বিহগেরা বাসা বাঁধে, শুস্ক কাঠের ভিতর।
শুকনো ডাল ঝরে পড়ে, পচনশীলে গুঁড়ি,
জালানী কুড়াতে থাকে, গাঁয়ের এক বুড়ি।
বিদীর্ণ বৃক্ষ গোঁড়া, প্রবেশি আলোকচ্ছটা,
শীর্ষেতে জীর্ণ শাখা, খসে পড়ে পত্রবোঁটা।
ছিলো হইতো কোনদিন, দিয়ে সবারে যশ,
নীরবে সহিয়া কস্ট, সেতো ছিলো নির্দোষ।

ভাঙ্গা কলসি

মোহাম্মদ তৌকির হোসেন

"তোর ভালোবাসার অন্ডথলি কাটি!"
রাশিকের দাঁত কিড়মিড় করা কথাগুলো সে ছাড়া আর কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। প্রশস্ত ছাদের একপাশে রাখা দুটো কবুতর খোপের ভেতর বাকুম, বাকুম শব্দ ভেসে উঠলো। নিচু, চাপা স্বরে। যেন জানান দিচ্ছে, ধরে ফেলেছি তোর কথা। চুলোয় যাক! জহন্দমে যাক খোপ। কালকেই কবুতর দুটোকে ধরে জবাই করে ফেলব। পেয়েছে কী ফ্ল্যাটের মালিক? গাদুস গুদুস কবুতর ছাদের উপর দিব্যি গটগটিয়ে হেঁটে বেড়াবে চোখের সামনে আবার রাতদুপুরে ভাব লুকিয়ে সহমর্মিতা দেখিয়ে ঢং করা হচ্ছে? শালার! পিচ করে থুথু ফেললো রাশিক।

মাথা উপরের দিকে ঘুরালো। আরো উপরে, আরো উপরে। একেবারে ঘাড়ের সাথে নব্বই ডিগ্রী করে। চাঁদ! থালাভরা রূপার রুপ দেখানো হচ্ছে? তোর রূপের ঘটার নিকুচি করি। পাথর, টাথর, গ্যাস ছাড়া শুকনো খটখটে। আবার এই নিয়ে কত অহং, কত স্পর্ধা! সব কবিমস্তিষ্কের শয়তানি। চাঁদ দেখে ইবলিশ সবার ভেতরে ভেতরে খোঁচা দেয়। নাইলে একে নিয়ে এত কান্ডকীর্তি করার কি আছে? শালার চাঁদ।

এই ছাদটাতে বৃষ্টিতে ভিজে প্যাচপ্যাচে অবস্থার তৈরী হয়েছে। এই ছাদে হাঁটার কোন মানে আছে? তবুও এইখানেই সব দেখতে হলো। ঠিক আছে, এইখানেই একেবারে শেষটা দেখেই ছাড়ব। রাশিকের কপালের ভাঁজ প্রচন্ড বিরক্তিতে কুঁচকোতে কুঁচকোতে শেষ সীমা দেখে ফেলছে। ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড রাগ হচ্ছে। একেবারে খুন করার মতো রাগ।
হাতের ফোনটার ব্রাউজারের পেজ আবার রিফ্রেশ করলো সে।
ছাদের পানির রিজার্ভার যে জায়গাটায় তার ঠিক সামনাসামনি বরাবর যে জায়গাটায় বাড়ির মালিক পালংশাক আর করলার ছোট্ট একটা চাষমতো করছেন সেটারও ঠিক পাশে, পাঁচ ছ হাত দূরে ছাউনি ঘেরা একটা বর্গাকার মতো সিমেন্টের সিটে বসে আছে রাশিক। ওই ছাউনির এক কোণায় ছোট্ট ষাট ওয়াটের হলুদ বাল্ব জ্বলছে। সেই বাল্বের কাছাকাছি পিলে পিলে কালো জমাটভরা অবস্থান তৈরী করে দিচ্ছে আলোর পোকা। সেই পোকাগুলোর উপর আক্রোশ চলে গিয়ে নিজের উপর আক্রোশ আবর্ত করতে থাকলো রাশিকের।

"মিস্টার রাশিক হাসনান,
ভালো আছেন? যদিও ফর্মালিটির হিসেবে বললাম তবুও চেষ্টা করবেন যেন ভালো থাকবেন। আমি কেমন আছি সেটা জানতে চান না?
হঠাৎ আপনি আপনি করে বলছি এটার কারণটা জানেন... এটাই আপনাকে লেখা আমার লাস্ট মেসেজ। শেষ বার্তাতে মানুষ আবেগ ঢেলে দেয়, স্মৃতিচারণা করে, একে অপরের জন্যে

শুভকামনায় ভরিয়ে তোলে। একটা লম্বা পথ অনেক ভার নিয়ে বয়ে বেড়াবার পর যখন শেষ প্রান্তের খুব কাছাকাছি চলে আসা হয় তখন অন্তরে কেমন কেমন একটা শান্তি লাগে। ভার নিয়েও, কেজি কেজি বোঝা নিয়েও একটা অপূর্ব শান্তি সেটা বোঝার নয়, ফিল করবার। তুমি অনেক ফিল করতে জানো।

ফিলিংএ একটা মজা আছে। লজিকের পাত্র সেখানটায় খাঁ খাঁ করে। আমিও জানতাম কিংবা এখনো জানি।

তোমার সাথে যেদিন একেবারে ফার্স্ট দেখা হয় সেই দিনটা আমার আজীবন মনে থাকবে। তুমি ফার্স্ট ইম্প্রেশনে একশতে একশ পাবা! নো মার্সি। কলেজের এক্সামের সেই মোমেন্টটায় যখন লেট হয়ে যাবার কারণে কাকলি ম্যাডাম সাইন করে দিচ্ছিল না প্র্যাক খাতাটায় কি সুন্দর তুমি চমৎকার নকল করে আমাকে বাঁচায় দিয়েছিলে। জীবন ওই জায়গায় বোধহয় আমি পরিবর্তনের ফাঁদে পা দিয়েছিলাম।

তুমিও তাই! আমারটাকে...

দেখলা, আমি ফরমালিটি রাখতে পারি না। আপনি আপনি করে বলতে পারা যাচ্ছে না তোমাকে। এরপরের কথাগুলো চাঁছাছোলা হবে কিনা এটাও জানি না। তবে সত্যটা তোমাকে জানানো দরকার।

আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে টিপেটুপে দেখলাম তুমি আমার কাছে এক হাজার দুইশ পঞ্চান্ন টাকা পাও। এর মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে পাই পাঁচশ সত্তর টাকা। সো কাটাকাটি করে আমি তোমাকে ছয়শ পঁচাশি দিব। এইচ এস সি শেষ হবার আগে আগে দিয়ে দিব ওয়াদা করছি। হিসাবটার মধ্যে বিভূতির "অশনি সংকেত" আমাকে যেটা জন্মদিনে গিফট দিয়েছিলে সেটার দাম পঁচাশি টাকা, ক্যাডবেরির প্রায় তিনটা সিল্ক প্যাকেট যেটার মোট মূল্য প্রায় ছয়শ টাকা, ফুল টুল মিলিয়ে আরো একশ টাকা, আর ফোন ব্যালান্সের এমাউন্টটাও ধরছি। এসবগুলা মিলিয়েই এই হিসাব। তোমার দেওয়া লাগবে না। আমিই দিব।

ব্রেকআপের খবরটা ইতিমধ্যেই শীলাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং আমি আমার ফার্স্ট লাভের কাছে ফিরে যাচ্ছি। ফার্স্ট লাভকে ভোলা অনেক কষ্টকর। হয়তো তুমি আমাকে ক্যারেক্টারলেস বলবা, পারভার্ট বলবা, স্ল্যাং করবা। কিন্তু আফটার অল আমি তো একটা মেয়ে। একটা মনের অধিকারী। আমি তো এটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারব না। এটাকে তো শুধু একজনের জন্যেই রাখা যায়। আমি সত্যিই কনফিউশনে ছিলাম রিলেশনশিপ করার আগে।

কিন্তু আসলে একজনকে আমার দরকার ছিলো। আমি ভেবেছিলাম, সেই একজনটা হয়তো আমার প্রথমজনটাকে ভুলিয়ে দিবে। পুরো প্রেডিকশানটাই জলে গড়িয়ে গেলো। প্রথমদিকে

মনে হচ্ছিলো আত্মা, শরীর একসাথে করে তোমার সাথে থাকতে পারব। সেটা করতে পারছি না।
আমি দু:খিত।
দু:খিত তোমার এতগুলো সময় নষ্ট করার জন্যে, আবেগ নিয়ে একপ্রকার খেলা করার জন্যে। যদিও আমি খুবই নিশ্চিত আমি খেলা করি নি। সেটা করার আগেই আমি ব্রেকআপ করে দিচ্ছি।

শীলা বলছিলো, প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারগুলোতে সেক্স না থাকলে জমে না। অন্তত সে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলো। আমি জানি না ব্যাপারটা কতটুকু সত্য। তবে ওটা বোধহয় কিছু একটা করে দেয়। আমাদের রিলেশন চলাকালে সে ওসব ট্রাই করার কথা আমাকে বলছিলো, যখন দেখছিলো আমি ঠিক তোমার সাথে ম্যাচ করতে পারছি না। কিন্তু আমার মন তাতে সায় দেয় নাই। বিশেষত তোমার মতো ভালো ছেলে এগুলোতে জড়িয়ে যাওয়াটা উচিত মনে হয় নাই তখন।

ইদানিং শুনছি তুমি নাকি কলেজ ক্যাম্পাসে আমাকে চড় মারবে সবার সামনে? সবাই তো তাই বলাবলি করছে। এটাকে রাখঢাক করে রাখতে তো পারতে। আনুষ্ঠানিকভাবে দশজনের কানে ঢোল পেটানোর কি দরকার ছিল! যদি এরকম উইশ থাকে প্লিজ ভুলে যাওনা। সময়টা হয়তোবা ভুল ছিলো। অন্তত কলেজে প্রেস্টিজটা নষ্ট করিও না। তুমি যখন ঠাস করে গালের ওপর দুটো বসিয়ে দিবে তখন আশপাশের দুটো তিনটা না কমসেকম বিশটা ছেলে দেখবে। সেই বিশটা ছেলে গিয়ে দশটা স্যার ম্যাডামকে লাগাবে। সেই দশটা স্যার ম্যাডাম প্রিন্সিপালের কানে পৌঁছায় দিবে। তারপর একজন বাবা এবং একজন মা সেই কাহিনী শুনবে।
তোমার পায়ে পড়ি এরকম করো না। এরকমভাবে অপমান করো না। শুধু এটার জন্যে , এই অপমানটা না হওয়ার জন্যে শরীর নিলে নিতে পারো। আমি বাধা দেব না।

স্কুলে পড়ার সময় রোজিনা ম্যাডামের অংক পরীক্ষাতে ত্রিশে আট পেয়েছিলাম। সেইদিন বাবার ঠাস ঠাস চড়ে আমার ১০৩ ডিগ্রী জ্বর উঠে গিয়েছিলো। পুরো এক সপ্তাহ বিছানা থেকে ডাক্তার আঙ্কেল আমাকে উঠতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। ফোবিয়া হয়ে গেছে আমার ওটাতেই জানো...."

ঠাস! ঠাস! একেবারে পিষে দিতেই লাল হয়ে গেলো হাতের তেলো। রক্তগুলো কেমন যেন আটকে জমাট হয়ে একটা গা গুলিয়ে ওঠা ভাব তৈরী করছে। শালার মশা! চৌদ্দগুষ্টির ওপর অভিশাপ। রাশিকের দাঁত কিড়মিড় করছে। মস্তিষ্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে এ্যাড্রেনালিন রক্তে সল্যুটেড হয়ে যাচ্ছে। আরো চাই, আরো! এলিজা একটা পারভার্ট ছিলো। রাশিক বিশ্বাসনক্ষত্রের কুঞ্জিতে এটা মেশাতে চাচ্ছে। পরক্ষণেই আবেগনক্ষত্র শাঁ করে ছুটে এসে সেটাকে ধোঁয়ায় মিলিয়ে দিচ্ছে। মহা মুশকিল!

আইফোনটাকে এক নিমিষে ছাদের পাঁচিল বরাবর রাতের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কোন দুনিয়ায় চলে যাবে এলিজা আর তার মেসেজ... কোন মুলুকে সেটা আইফোন নিজেও জানবে না। এলিজা এটা কিভাবে করলো? গত পরশুদিনই তো ক্যাফে টোয়েন্টি ফোরে কাপাচিনো খেতে খেতে এলিজার কি হাসি! এত হাসি যেন মনেই হয় না এ মেয়ের ভেতরে কিছু সমস্যা আছে। এখন তো মনে হচ্ছে ছোটখাট না বড়সড় সমস্যা এ মেয়ের মাথায় আস্তানা গেড়ে বসেছে। শরীরের বিনিময়ে অপমান রোধ! নিজের মূল্যবোধ , নৈতিকতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকলে আরকি!
এরপর খুব খারাপ একটা গালি মনে করার চেষ্টা করে রাশিক। এটা নিজের জন্যে। কেন এই ধরনের চরিত্রহীনার সাথে এই কয়েক মাস কাঁঠালের আঠার মতো প্রেমে আটকে ছিলো। কেন?

"মাথার ভেতর গাঞ্জা চলে, গাঞ্জার ভেতর মাথা..."
গাঁজা খাব? ওদিকটাতে, কলেজের পেছনের টংএর মোড়টাতে খুব ভালো কিছু গাঁজা বিক্রি হয়। কামরুল আর সায়ন একবার টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিলো সেদিকে। কোচিং ফাঁকি দিয়ে গাঁজার সুখটানের আকাঙ্খা সেদিন ছিলো না। এখন হঠাৎ আকাঙ্খা জেগে উঠেছে। হয়তো গাঁজার গান শোনার জন্যে। শোঁ শোঁ করে বুঝি টান দিতে হয়। দিলেই মজা! আহ কি মজা!

সিমেন্টের জায়গাটা থেকে উঠে দাঁড়ালো রাশিক। নিজের পা দুটোকে পাথর পাথর মনে হচ্ছে। মনে ভাবনা আসলো, গাঁজা খেলে পালক পালক লাগবে। শান্তিমতো গাঁজা নিতে যাব সেখানেও নানা ফ্যাঁকড়া। বাসায় অবরোধ জারি করে রাখা হয়েছে। এইচএসসি মৌসুম। দুইমাস বাকি। কোচিং, কলেজ সবই বন্ধ। কোন উপায় ঘরের ছিদ্র থেকে বেরুবার। টেস্টের রেজাল্ট দেখে সোসাইটির একেকজনের কি আশা, আকাঙ্খা! যেন কলসি বেয়ে বেয়ে রাশিকের মাথা থেকে মেধা গড়িয়ে পড়ছে! রেজাল্ট কার্ড জোগাড় করা সোজা ছিলো। একশ টাকা দিয়ে কিনলেই পূরণ করে, সাইনটা নকল করে দিলেই হলো। অতটুকু পর্যন্ত সবকিছুই চিন্তাভাবনা মোতাবেক চলছিলো।
সমস্যাটা তৈরী হয় ওই প্রিন্সিপ্যালের ফোনকলটার পরপরই।

"জ্বী স্যার। বলুন।"
পরিচয় জানার পর ফোনটা কানের কাছে নিয়ে শশব্যস্তভাবে সটান হয়ে দাঁড়ায় মিসেস খালেদা, রাশিকের মা।

"আপনার ছেলে প্রতিদিন কলেজ আসে। এটা জানেন?"
শুষ্ক গলা প্রিন্সিপ্যালের।

"জ্বী স্যার। তার প্রতিদিন শার্ট আয়রণ করে দেই আমি। ভাঁজও পড়তে দেই না স্যার।"

এ প্রান্তে রাশিকের মায়ের ভাঁজ পড়া মুখে গর্বিত হাসির রেখা।

"প্রতিদিন সে ক্লাসে এসে বামদিকের কোনার সিটটা দখল করে থাকে।"
নাবছে স্বর।

"তাকে স্যার স্কুল থেকেই ওরকম অভ্যাস করিয়ে এসেছি স্যার।"
হাসিটা আরো দুই সেন্টিমিটার চওড়া হয়ে এপাশ ওপাশ বিস্তৃতি লাভ করলো।

"কলেজের কোন আড্ডাবাজ ছেলেদের গ্রুপে তাকে পাবেন না।"
কোমল অথচ দৃঢ় স্বর।

"না না স্যার। হেঁ হেঁ।"
এবার শুধু হাসিটার একান ওকান হওয়া বাকি।

"তাকে সবসময় কলেজে মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখা যায়। বামকোনায় বসে স্মার্টফোনে গুঁতোগুঁতি করতে দেখা যায়। আমি জানি, রাশিক অনেক ভালো ছাত্র। এপিএমও থেকে ব্রোঞ্জ মেডেল পাওয়া স্টুডেন্ট আমাদের কলেজে পড়ে এটা তো গর্বের বিষয়। কিন্তু এই গর্বের বিষয়ের বোধহয় দিন ফুরিয়েছে। টেস্টের পাঁচটা সাবজেক্টে তার লাল কালির দাগ।..."

হয়তোবা আরো কথা ভেসে আসছিলো ওপ্রান্ত থেকে। তবে এপ্রান্তে মিসেস খালেদা সাহেবান আর প্রান্ত খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তীরে এসে শেষে তরী ডুবলো বলে!

সেই থেকে রাশিক বন্দী। যাকে বলে একেবারে কুপোকাত। ফেসবুক ছাড়া নেই কোন সম্বল , নেই কোন যোগাযোগ। এলিজা ছাড়া নেই কোন সঙ্গী, নেই কোন বান্ধবী অথবা নেই কোন বন্ধু। পড়াশোনা তার লাটে উঠেছে। বারো নাম্বার লাটের তের নাম্বার ফ্লাটে। এইচএসসিতে ফেল করবে নির্ঘাত! এখন কী হবে? এলিজাও গেলো, একূলও গেলো, ওকূলও গেলো। এখন এপিএমওর ব্রোঞ্জ দিয়ে করবে কি সে! ওসবের প্রতি আগ্রহ শূণ্যে কোঠায় চলে গিয়েছে অনেক আগেই।

রাশিক দাঁড়িয়ে এবার একটু ভাবে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবার চেষ্টা করে।

পরশুদিনের এলিজার গায়ের টপসটা শালার জোশ ছিলো তো! এরপর তার একটা খারাপ গালি মনে পড়ে যায়। গালিটা সে দেয় নিজেকে, ছাদের বাসিন্দা আলোর পোকাগুলোকে।

****

"এ্যাই ছেলে জোরে পড় বলছি।"

"উঁ উঁ.. আমাদের দেশটা উঁ উঁ.. অতিশয় সুন্দর। উঁ..সবুজ র -"
"অতিশয় বানান করে লেখ।"

বালুকাবেলা হাউজিং সোসাইটির ভেতরের ডানদিকে গেলেই ছয়তলা ফ্ল্যাটটা চোখে পড়ে। সেই ফ্ল্যাটের দুইতলার জানালার রিডিং রুমের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। ঘাড়ের দিকটায় ঘামে ভেজা দেহের অধিকারিণী তাঁর আদরের পুত্রকে অতিশয় বানান লিখতে বলছেন। রুক্ষ, দাপুটে স্বরে।

"এটা কী লিখছিস? কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং... পড়।"

"আমাদের দেশ... অতিশয় উঁ উঁ সুন্দর। এখানে উঁ উঁ পাই মোরা সবুজ উঁ উঁ রঙা..."

"সবুজ বানান লেখ।"

"আম্মু, পড়তাম না এখন। পানি খাব।"

"পানির চিন্তা বাদ। লেখ বানান। উঠার খালি ছলচাতুরী। এখন পানি , পরে খিদা। আবদারের শেষ নাই।"

"পানি খাব। উঁ..."

এরপর আমরা নাহয় কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকি। কেননা এরপরের দৃশ্য বাচ্চাটির পিঠের ওপর ধুমধাম কিলের শব্দের জোরে চাপা পড়ে যায়। আমরা বরং সেই বাক্যটি আরেকবার পড়ি। "আমাদের দেশ অতিশয় সুন্দর। এখানে পাই মোরা সবুজ রঙা..." বাক্যটির পরের অংশ কি হতে পারে সেটি নিয়ে ভাবতে থাকি। সবুজ রঙা ক্ষেত হতে পারে, সবুজ রঙা ধান হতে পারে। আর কি হতে পারে সেটি নিয়ে খেলা করার সময় এবং ভাববার সময় আমাদের ভাবনার কানে আর একটি ছেদ পড়ে। সেটি ধুম ধাম কিলের শব্দের কারণে নয়। সেটা একটু অন্যরকম শব্দ হবার কারণে। ধপা ধপ শব্দ। বাচ্চার মা বাচ্চার দিকে চোখ তুলে তাকায়। বাচ্চাও মায়ের দিকে কান্না ভুলে চোখে চোখে রাখে। দুজনেই এবার একটু করে ভাবে।

এরপরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, রিডিংরুমের জানলা দিয়ে বাচ্চার মা ও বাচ্চাটি গলা বের করে দিয়েছে। বাচ্চার মা সাথে সাথেই বাচ্চাটির চোখ চেপে ধরলো। তবে বাচ্চার মা নিজে জানলা দিয়ে গলাটি আরেকটু বাড়িয়ে দিলো।

বালুকাবালি হাউজিং সোসাইটির সেই ফ্ল্যাটটির নিচে তখন একটা ছোটখাট জটলা বাঁধতে শুরু করেছে। সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা কাঁচাপাকা লাল রঙা দাড়ি নিয়ে আক্কাস মিয়া তীক্ষ্মস্বরে সিটি বাজাতে বাজাতে বিল্ডিং এর দিকে ছুটে আসছেন। ফ্ল্যাটটির তিনতলা থেকে

একজন মা দৌড় দিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছেন। প্রেক্ষাপটে গমাগম শব্দটি এবার নতুনরূপে দেখা দিতে শুরু করেছে।

আমরা দেখতে পাই, বাচ্চাটি তার চোখ কখন হাতের তেলোর অংশটা থেকে মুক্ত করে ফেলেছে। এবং পরক্ষণেই সে আবার কাঁদতে শুরু করলো।

"ভ্যাঁ...আম্মু..."

"চুপ বাবা কাঁদে না, চুপ চুপ। ও কিছু না।"

আমরা দেখতে পাই, জটলাটির মাঝে রাশিকের কালো রক্তগুলো ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে। ঠিক যেমন কলসি বেয়ে বেয়ে মেধা গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ জায়গাতে সম্ভবত রাশিকের মস্তিষ্ক থেকে এ্যাড্রেনালিন জমাটবাঁধা লাল রঙা হয়ে বেরিয়ে আসছে। রাতের আঁধারে তা আলাদা করাই মুশকিল।

শালার মেধা!

জীবনের পথে

আব্দুল্লাহ আল মোজাহিদ

জীবন কি? হে মানব, একটু ভাব বসে
জীবন কোথায়? একটু দেখ অঙ্কটা ক'ষে|
জীবন কোন ফুলশয্যা নয়; যা পুষ্পে সাজা রবে,
কিংবা কোন খেলাঘর নয়; যা অচিরেই ভেঙ্গে যাবে!
তবে জীবন কি? না'কি কোন বহমান নদী;
জীবনের তরে' শ্রম দাও সখা, অঙ্কটা মেলে যদি|

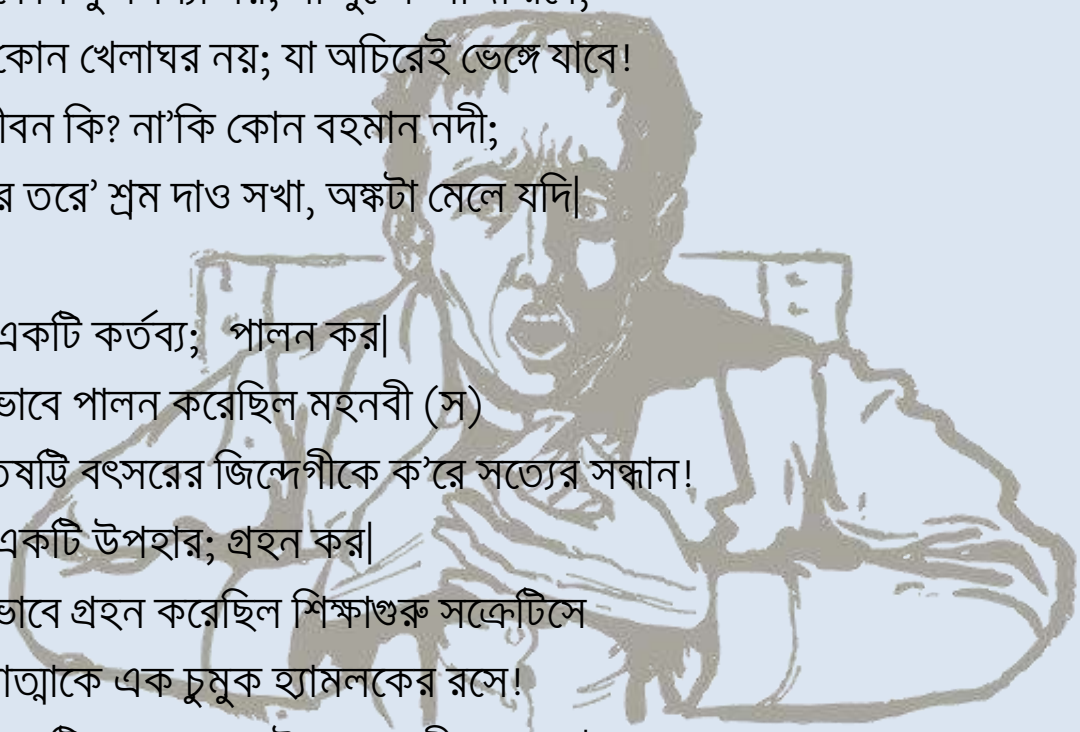

জীবন একটি কর্তব্য; পালন কর|
যেমনিভাবে পালন করেছিল মহনবী (স)
সঁপে তেষট্টি বৎসরের জিন্দেগীকে ক'রে সত্যের সন্ধান!
জীবন একটি উপহার; গ্রহন কর|
যেমনিভাবে গ্রহন করেছিল শিক্ষাগুরু সক্রেটিসে
সঁপে আত্মাকে এক চুমুক হ্যামলকের রসে!
জীবন একটি দুঃখজনক ঘটনা; স্বীকার কর|
যেমনিভাবে স্বীকার করেছিল মহা-তরুণ কলম্বাসে
তিমির-বদ্ধ লৌহ কারাগারে সঁপে যৌবন সাধনাকে!
জীবন একটি রহস্য; উদ্‌ঘাটন কর|
যেমনিভাবে উদ্‌ঘাটন করেছিল মহাসাদিক গ্যালিলিও
শত লঞ্ছনা-গঞ্জনার দহনেও সত্য ছাড়েনি মোটেও!
জীবন একটি গীতি; গুঞ্জন কর|
যেমনিভাবে গুঞ্জন করেছিল বাউল সম্রাট শাহ্ লালন
মৃত্যু-পূর্ব রাত অবধি মুখভরা গুন-গুন গুঞ্জন!
জীবন একটি দুঃখ; জয় কর|
যেমনিভাবে জয় করেছিল মহবীর দুখুমিয়া
চরম দারিদ্রের কণ্টক মুকুট আপন শিরে গুঁজিয়া!

জীবন একটি প্রতিযোগীতা; অংশগ্রহন কর|
যেমনিভাবে অংশ নিয়েছিল সুকান্তের মত তরুণ কবি
‘পূর্ণিমা-চাঁদ’টি যার কাছে এক ঝলসানো রুটির প্রতিচ্ছবি!
জীবন একটি ক্রীড়া; পরিচালনা কর|
যেমনিভাবে খেলেছিল নোরগে’র মত বীর-বিজয়ী সেনা
এভারেস্টের দূর্গম চূড়া আরোহনের বিরামহীন সাধনা!
জীবন একটি সুযোগ; গ্রহন কর|
যেমনিভাবে গ্রহন করেছিল বক্তিয়ারের অষ্টাদশ সৈনসমরে
ভীত লক্ষণের অবসান ঘটায় নদীয়া দখল করে!
জীবন একটি দুঃসাহসিক অভিযান; সাহস কর|
যেমনিভাবে উদ্যত হয়েছিল তিতুমীর-ক্ষুদিরাম
বাংলার মাটি থেকে শত্রু তাড়ানোর সাধনা অবিরাম!
জীবন একটি অঙ্গীকার; পূরণ কর|
যেমনিভাবে পূরণ করেছিল বায়ান্নর বীর ভাষাশহীদ গনে
আজও একুশে ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি যাদের স্মরণে!
জীবন একটি সংগ্রাম; যুদ্ধ কর|
যেমনিভাবে যুদ্ধ করেছিল একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা গনে
পৃথিবীকে দেখিয়েছিল: দেশের জন্য তারাও জীবন দিতে জানে!
জীবন একটি শস্যক্ষেত্র; চাষাবাদ কর|
যেমনিভাবে ফসল ফলায় কৃষাণ মজুর শ্রেণী
এই ধরণীর সন্তান সবে যাদের কাছে চিরঋণী!

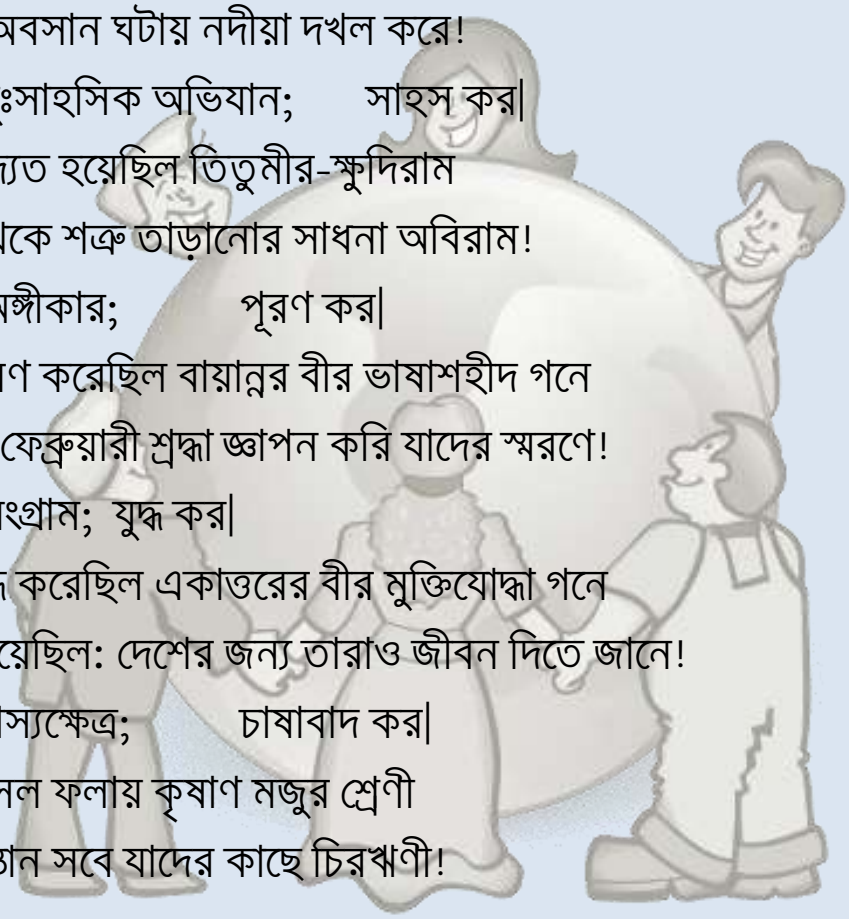

জীবনের সুখ ভোগে নয় ভাই, প্রকৃত সুখ ত্যাগে
সকলের তরে তোমার জীবন; তুমিই সবার মাঝে|
এইতো জীবন; এইতো যৌবন; এইতো মানব সাধনা,
সুন্দর করে গড়বো জীবন, এটাই হোক মোদের বন্দনা॥